বাঙ্গলা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

প্রণেতা ও প্রকাশক—

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, বি, এ,।

ভুহালিয়া, শ্রীহট্ট।

১৩৩০ বাং।
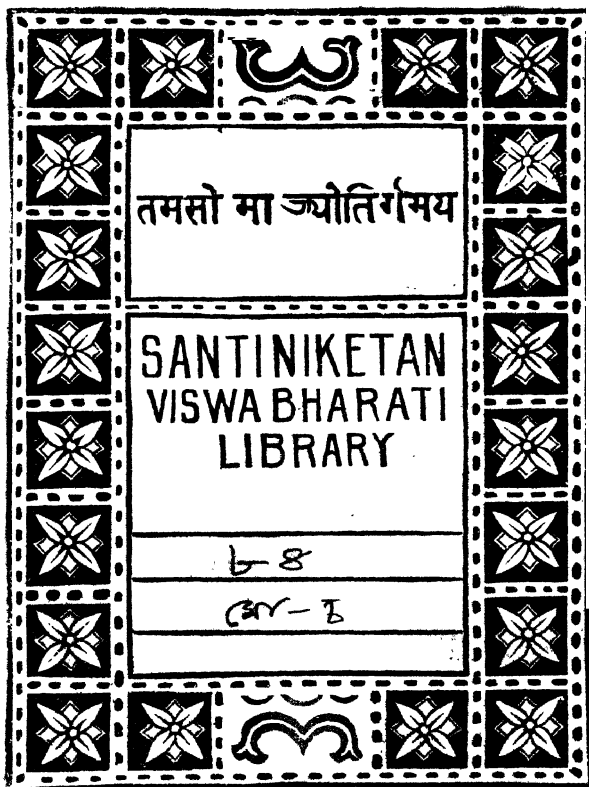
স্মৃতিপত্র।

ভাই,

আরবাব ও আলবাব,

আজ তোমরা দুনিয়ায় নাই। তোমরা আমার কর্ম্ম-জীবনের সাথী ও সাহিত্য সেবার সহযোগী ছিলে। আজ তোমাদের অশ্রুসিক্ত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক তোমাদের পবিত্র নামে অর্পণ করিলাম। আল্লাহ তোমাদের মগফিরত করুন। আমীন।

তোমাদের হতভাগ্য

ভাই।

নিবেদন।
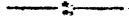
বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন নূতন কথা বলিবার আমার কিছুই নাই। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পুনরায় নিজের ভাষায় বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ইহাতে কতদূর সফল হইয়াছি তাহা সুধীজনের বিবেচ্য। "সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে; কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না।" এই কথাটি ব্যক্তিগত ভাবে খাটিতে পারে। কিন্তু সমাজ ও দেশ হিসাবে খাটিবে না। আমার কোন কোন লেখা কাহারও নিকট সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা Communal patriotism বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা অপ্রিয় হইলেও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মেলেরিয়ায় ধরিলে কুইনাইন তিক্ত হইলেও সেবন করিতে হয়।

সভা সমিতির মিষ্ট কথার লেপনে; মৌখিক ভ্রাতৃত্ব ও গরজের বন্ধুত্বে হিন্দু মুসলমানের মিলন স্থায়ী হইবে না। আমাদের সাহিত্য হইতে হিংসা বিদ্বেষের গলিত অংশ চিবাইয়া বাহির করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

যাহাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে আমি সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় এ পুস্তকের নানা স্থানে সংশোধন করিয়া আমাকে যথেষ্ঠ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এ পুস্তকে অনেক ত্রুটি আছে। ভবিষ্যতে সংশোধনের আশা রহিল। আমার কোন কথায় কেহ মনোকষ্ট পাইলে আশা করি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

কবি দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষায় :—

"করেছি কর্ত্তব্য যাহা সেই টুকু আমার যাহা জমা;
করেছি অন্যায় যাহা সেই টুকু খরচ—দিও বাদ,
তোমাদিগে যে টুকু দিয়েছি দুঃখ, কর ভাই ক্ষমা।
তোমাদিগে যে টুকু দিয়েছি সুখ করো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসিনাকো কর্ত্তে বিসম্বাদ ;
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মন দুঃখ ভাই ;
দুঃখ যদি পেয়ে থাক ভ্রান্তিবশে ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি কোন দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশী হ'য়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমাই যদি বেশী থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।"

খাকছার ফিদ্দবি

মোহাম্মদ আহবাব।

সূচীপত্র।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা।

"এ জগতে সাহিত্য কত দিনের? মানুষ এখানে যত দিনের, মানুষের সাহিত্যও এখানে তত দিনের। কবে এ পৃথিবীতে মানুষ প্রথম দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝিবার যেমন উপায় নাই; সেইরূপ মানুষের সাহিত্য মানুষের সমাজে কবে উদিত হইয়াছে তাহাও জানিবার কোন পথ নাই।"

বাঙ্গলা ভাষা কোন শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কোন সাহিত্য জ্যোতিষী বলিতে পারেন না। যে দিন হইতে হজরত আদমের বংশধরগণ বাঙ্গলা দেশে বসবাস করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি। বাঙ্গলা ভাষার আদি ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা দেখিতে পাই ইহা প্রাথমিক যুগে নানা অবহেলার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ছিলেন অর্দ্ধ শিক্ষিত মুন্সী সাহেবেরা ও গ্রাম্য স্বভাব কবির দল। তাহারা অনেক সময় নিজ সখ মিটাইবার জন্য বা গ্রামে একটু নাম অর্জ্জন করিবার জন্য কবিতা রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব তৃষ্ণা মিটাইতেন। আবার কেহ কেহ "সে গ্রামে মনিষ্য যত, ফারসী না জানে কত, পুস্তক রচিয়ে সে কারণ।" উচ্চতর উদ্দেশ্যেও উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন। পাঠক ও শ্রোতা ছিল অশিক্ষিত

কৃষক সম্প্রদায়। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তাহারা ;আমির হামজা, হালেতুন্নবি, গুলে হরমুজ, ফতেহুশ্বাম প্রভৃতি পড়িয়া আপনাদের শ্রান্তি দূর করিত। জঙ্গনামা, শহিদে কারবালা পড়িয়া কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনী শুনিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। "এয়ছা জোরে গোর্জ্জ মারে আমীর পয়লোয়ান, পাহাড়ে লাগিত যদি হইত খান খান।" শুনিয়া গ্রাম্য সম্প্রদায়ের তাক লাগিয়া যাইত। ফতেহুশ্বাম, ফতেহুল মিছির জঙ্গে খয়বর পড়িয়া নিস্তেজ নিরীহ প্রাণে একটু সাড়া দিত। শাহনামার রোস্তম ও গোদর্জ্জের গোর্জ্জের আঘাতে তাহাদের হৃদয় বীরত্বে পূর্ণ হইয়া যাইত। তাহারা ভাবিত অতীত মুসলমানদের মধ্যেও এমন বড় বড় পয়লোয়ান গুজরিয়া গিয়াছেন।

নোয়াবী যুগে ফারসী ছিল রাজভাষা। সংস্কৃত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বা শিক্ষিতের ভাষা। আর বাঙ্গলা ছিল অপভাষা বা অশিক্ষিতের ভাষা। মৌলবী সাহেবেরা কাফেরের জবান বলিয়া বাঙ্গলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। এখনও কোন কোন বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু চালাইবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। * মৌলবী আকরম খান সাহেব বাস্তবিকই বলেন :—"দুনিয়ার নানা অদ্ভুত কথা আছে ; কিন্তু সব অদ্ভুতের অদ্ভুত কথা বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা উর্দ্দুর চেষ্টা করা।" বাঙ্গলার সোনার জমিতে ধানের পরিবর্ত্তে গমের চাষ কখনও সফল হইবে না। ফলিলেও ইহা শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ভাতের বদলে রুটি ও ছাতু খাইয়া বাঙ্গালী মুসলমান তাহা হজম করিতে পারিবে না।

পণ্ডিত মহোদয়গণের দশাও তদ্রূপ ছিল। তাঁহারা দেবভাষা সংস্কৃতেই সমুদয় শাস্ত্র গ্রন্থাদি লিখিতেন।

* কেহ যেন মনে না করেন আমি উর্দ্দু শিক্ষার একান্ত বিরোধী। উর্দ্দু শিক্ষা করাও বাঙ্গালী মুসলমানের দরকার। তবে অবশ্য মাতৃভাষা বা প্রধান ভাষারূপে নয়, দ্বিতীয় ভাষারূপে।

দর্শন ও কাব্য আলোচনা সংস্কৃতেই করিতেন। বাঙ্গলা ভাষা অপভাষা বলিয়া সেই ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা করা নিন্দার বিষয় মনে করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদকগণকে "রৌরব" নামক নরক বাসের ব্যবস্থা দান করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা আদি যুগে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত সমাজের নিকট আদর পায় নাই। গ্রাম্য অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের পুথিতে গিয়া আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাচাইয়া রাখিয়াছিল। এইরূপ নানা প্রতিকুলতার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা ভাষা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাভাষা এক নূতন আকার ধারণ করিল। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্য যদিও বেশ সজীব ছিল, কিন্তু সমুদ্রের

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষার প্রচলনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মুসলমান সমাজের কোন কোন তথাকথিত নেতা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দ্দু বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহার চেয়ে হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? যাহারা এইরূপ মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, তাহারা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি নহেন। আমরা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, কলিকাতা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের যে কয়েকটী মুষ্টিমেয় পরিবারে উর্দ্দু কথিত হইয়া থাকে, ইহারা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বিশাল সমুদ্রে এক একটি দ্বীপের ন্যায় বিরাজমান, না না তাহাও নয় তাহারা কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভাসমান, যাহার শিকড় বাঙ্গলার মাটি আকড়িয়া ধরে নাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি, এবং যাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্য ও পুস্তক নির্ব্বাচনে মুসলমান সমাজের স্বার্থ বজায় থাকে তৎপ্রতিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (এ সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া একটা বদনাম আছে, নব গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্ণাম দূর হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।)

পশ্চিম পারের নূতন হাওয়া লাগিয়া বাঙ্গলা ভাষা এক নব জীবন লাভ করিল। পূর্ব্বে বঙ্গ কবিরা প্রায় সকলেই পল্লীবাসী ছিলেন। তাহাদের ভাব ও আদর্শ সাধারণ ধরাণের ছিল। তাহারা স্বীয় গ্রন্থে গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ সমূহ এমন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন যে এক জেলার লেখা অন্য জেলাবাসীর বুঝা মুস্কিল হইত। এখনও অনেক প্রাচীন পুথি সাহিত্যের অর্থ গ্রহণ করা এক সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এখন সে সমস্যার দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র বঙ্গ-ভাষা ভাষী লোকের সাধারণ সম্পত্তি। সকলেই এখন একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষা বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের গীতাবলী, বৌদ্ধ যুগের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও মাণিকচন্দ্রের গান এবং আলোয়াল ও হামেদ আলী প্রভৃতির রচনাই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইংরেজ আমলের পর হইতে বাঙ্গলা ভাষা প্রকৃত বাঙ্গলা সাহিত্যে পরিণত হইল ও পৃথিবীর উন্নত সাহিত্য সমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিল। † বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রথম পত্রিকা "সমাচার-দর্পন" ইংরেজপাদ্রী জন ক্লার্ক মারশমেন

---

† Nathanial Brassey Halhed সাহেব ১৭৭৮ খৃঃ অঃ ইংরেজী ভাষায় সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। "চিরস্মরণীয় চার্লস্ (পরে সার চার্লস) উইল্কিন্স নামা এক সাহেব প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে সর্ব্বাগ্রে ১৭৭৮ খৃঃ অঃ স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া এক প্রস্ত বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের উপরি ভাগে প্রবচন স্বরূপ (motto) লেখা আছে :—

"বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামু পাকারার্থং
ক্রিয়তে হালহেড ভগ্রেজী"

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃষ্ঠা—২০০

রামগতি ন্যায়রত্ন।

সাহেব ১৮১৮ খৃঃ অঃ প্রকাশ করেন; বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্ব প্রথম ব্যাকরণও তাঁহারা লেখেন এবং বাঙ্গলা অক্ষর কাটিয়া বাঙ্গলা মুদ্রা যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষার অনাদর করিলেন; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংরাজপাদ্রী আসিয়া আমাদের মাতৃভাষার নবজীবন দান করিলেন। ইহা হইতে আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নোয়াবী যুগ বা আলোয়ালী যুগ, হুছেনী যুগ ও বর্ত্তমান যুগ। বাঙ্গলা ভাষার প্রারম্ভ হইতে নোয়াবী যুগে যে সাহিত্যের চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং যে যুগে আলোয়াল প্রমুখ মহাকবিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল ইহাকে নোয়াবী বা আলোয়ালী যুগ বলা যাইতে পারে। আলোয়ালের পর বিষাদ সিন্ধু প্রণেতা মীর মশররফ হুছেন যে যুগে সাহিত্যকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাকে হুছেনী যুগ এবং ইহার পরে বর্ত্তমানে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাকে বর্ত্তমান যুগ বলা যাইতে পারে।

"এ দেশে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব ও বঙ্গ ভাষার উৎকর্ষ একই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মুসলমান বঙ্গভাষাকে নিজের মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহারাই যে বঙ্গ ভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দাতা ছিলেন, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

"দীর্ঘ ছয় শতাব্দি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যখন বঙ্গ ভাষা নিতান্ত দীন হীন বেশে তখনকার বিদ্বৎ সমাজের ও হিন্দু নরপতিদিগেরও আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া হতাশ হইয়াছিল, যখন ললিত—লবঙ্গলতা—পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় পদ আওড়াইতে না পারিলে কেহ লোকের কাছে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না, যখন বঙ্গ ভাষায় শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদকগণের জন্য তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, ভ্রূণহা, ব্রাহ্মণঘাতী ইত্যাদি মহাপাতকী-গণের জন্য নির্দ্ধারিত রৌরব নামক ভীষণ নরকের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, বঙ্গ

ভাষার সেই অতি কঠিন বিপদের সময় মুসলমানই তাহাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বরের মণি মুক্তা বিখচিত রাজ সিংহাসনে বসাইয়া রাজ রাজেশ্বরী করিয়া দিয়াছিল।

"গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণের দরবারে বঙ্গ ভাষার এই প্রতিপত্তি দেখিয়া অধীন হিন্দু রাজা ও জমীদারগণও ক্রমে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাইত নছির সাহেবকে সম্বোধন করিয়া অমর কবি বিদ্যাপতি "চিরঞ্জী পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস, কাশী-রাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, বিদ্যাপতি যশোরাজ খান, গুণরাজ খান, বিজয় গুপ্ত, কবিরাজ কৃষ্ণ দাস দাস প্রভৃতি প্রথম যুগের মহাকবিগণকে আশ্রয় ও উৎসাহ দিয়া নছির শাহ, হুছেন শাহ, পারাগল খাঁ, ছোটে খাঁ, মাগন ঠাকুর প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণই গৌরব সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।" (আক-রম খান)। বাদশাহের উদাহরণে ওমরাহ ও জমীদারগণ অনুকরণ করিলেন। বাদশাহ যাহা আদর করিলেন, সমগ্র বাঙ্গলা দেশ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল।

আমরা দেখিতে পাই গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর যত্ন ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মুসলমান কবি আলোয়াল, হামেদ আলী, মোহাম্মদ ছগীর, আবদুল হাকিম, দৌলত উজির, নছরউল্লা খান, প্রভৃতি শত শত মুসলমান কবিগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। "হিন্দুর রামায়ণ আছে, মুসলমানের আমির হামজা আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে; মুসলমানের কাছাছোল আম্বিয়া আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে, মুসলমানের মারিফতি গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে, মুসল-মানের পদ্মাবতী আছে।" (শহীদুল্লা) আমাদের নাই কি? আমাদের সবই ছিল, সবই আছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সিরাজী সাহেবের মতে আট হাজারের বেশী মুসলমানের লেখা পুথি আছে। এই সকল অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থ লিখিলে যে ইহা দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষাও বৃহৎ আকার গ্রন্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে কি কোন দীনেশ চন্দ্রের আবির্ভাব হইবে না!

মুসলমানগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্মদাতা না হইলেও তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ স্বীয় মূঢ়তা বশতঃ অনেক পিছনে পড়িয়া রহিলেন। তাহারা রাজ্য হারাইয়া জেদ করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিলেন আর তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতাগণ ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন প্রকাশ করিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যকে মুসলমানের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজে পূরা দস্তর দখল করিয়া ফেলিলেন। আমাদের আলেম সমাজ যখন দেখিলেন যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে আল্লা, রছুল, নমাজ রোজার কথা ও ইসলাম ও মুসলমানী ভাবের নাম গন্ধও নাই, বিশেষতঃ হিন্দুয়ানী ভাবে ভরপুর. তখন তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে মুখ ফিরাইলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকে কাফেরের জবান বলিয়া অবহেলা করিলেন। বাস্তবিকই স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বাংলা সাহিত্য যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোন দিনদার পরহেজগার মুসলমানই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

দুনিয়ার সব জাতি যখন স্বীয় বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এক সুদীর্ঘ নিদ্রার পর বাঙ্গলার মুসলমানের ঘুম ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই মোহ নিদ্রার সুযোগ ছোট বড় হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাহাদের প্রাণে আঘাত দিতে বা তাহাদের চরিত্র কলঙ্ক কালিমায় লেপন করিয়া কালি কলমের অপব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। নানা ভোগ ভোগিয়া তাহাদের জ্ঞান জন্মিল। তাহারা উঠিয়া দেখিলেন, হিন্দুরা বহু আগে পৌছিয়া কেল্লা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। তথায় হিন্দু বিজয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের জয় ঘোষণা করিতেছে। মুসলমানেরা সেখানে গিয়া দেখিলেন তাহাদের প্রতি দ্বার রুদ্ধ! সমালোচক পাহারওয়ালারা কড়া সুরে প্রবেশ নিষেধ করিতেছে। প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় কেহ কেহ যে অর্দ্ধচন্দ্র খান নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আর কেহ কেহ মাথার টুপি ফেলিয়া ছদ্মবেশে প্রবেশ লাভ করিলেন।

মৌলবী সাহেবেরা উর্দ্দু ভাষায় ওয়াজ করিয়া দেখিলেন দেশের লোক তাহা বুঝে না। লোকে তাহাদের মুখের দিকে হা করিয়া থাকে। দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপী ওয়াজ শুনিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। আর মধ্যে মধ্যে "আহলে দুনিয়া কাফেরাণ মতলক আন্দ" শুনিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। উর্দ্দু ভাষায় মছলামছায়েলের কিতাব লিখিয়া দেখিলেন, তাহাদের বই বাজারে কাটে না, পোকায় কাটে। তাহারা আরও দেখিলেন যে সামান্য লেখা পড়া জানা মুন্সী সাহেবেরা ঘরের কথায় ওয়াজ করিলে শত শত লোক বেহেস্ত, দোজখ, আহকাম আরকান শরা শরিয়তের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া জার জার হইয়া যায়। তাহাদের আরবী ফারসী বাঙ্গলা মিশ্রিত কেতাব শাস্ত্র হাজার লোকে পাঠ করে। বিশেষতঃ এই খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনের যুগে আমাদের বাঙ্গলার উলামায়া দায়ে পড়িয়া বাঙ্গলা শিখিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহারা মত পরিবর্ত্তন করিলেন। বাঙ্গলা ভাষাকে আর ঘৃণা করিলেন না। বাঙ্গলা ভাষার সেবায় মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাহারা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানের উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বীয় মাতৃ ভাষার উন্নতি ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহারা "হ্যাম বাঙ্গলা নাহি জানতা হ্যায়" বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন, তাহারাও মাতৃভাষার সেবায় মন দিলেন। কারণ তাহারা দেখিলেন, ইংরেজী ভাষায় প্লেটফর্ম্ম কাঁপাইয়া গলা ফাটাইয়া লেকচার দিলেও দেশের লোকে তাহা বুঝে না ও শুনে না। তাহারা আরও বুঝিতে পারিলেন বক্তৃতামঞ্চ কাঁপাইয়া যোন রিজলিউশন পাশ করিলেও ইহা জাতির 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে' না। সভায় এই হট্টগোল সভা ভঙ্গের পরই বাতাসে বিলীন হইয়া যায়। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর নিকট "বাঙ্গলার কথা" বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। তাই আজ হেকিম আজমল খান দেশবাসীর নিকট দেশের ভাষায় স্বীয় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলেন তাই আজ দেশের ছোট বড় প্রত্যেক সভায় মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেওয়া একটা

প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন আমরা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ আলোচনা ও কথা বলিতে বলিতে নিজ দেশে পরদেশী হইয়া পড়িয়াছিলাম এই যে দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, ইহা আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে বড়ই মঙ্গল-প্রদ। মাতৃভাষার এই আলোচনা, মাতৃভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধা আমরা ভারত-বাসী বিশেষতঃ বাঙ্গলা জাতি যে এখনও মরি নাই, আমরা যে এখনও বাচিয়া আছি তাহাই প্রমাণ করে। যে জাতীর স্বীয় মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে জাতীর patriotism একটাকপটতা, একট যাত্রা গানের অভিনয় মাত্র। যে জাতি নিজ মাতৃ ভাষাকে অনাদর করে, সে জাতির একটা জাত নাই, একটা প্রাণ নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে
আরবী ফারসী শব্দের স্থান।

বাঙ্গলা দেশ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্মভূমি। হিন্দুর শ্মশান ও মুসলমানের গোরস্থান একই স্থানে অবস্থিত। বাঙ্গলার আবহাওয়ায় উভয়েই পরিবর্দ্ধিত। বাঙ্গলা সাহিত্য ও সেইরূপ কেবল হিন্দুরও নহে; মুসলমানেরও নহে। ইহা হিন্দু-মুসলমান সকলের সাধারণ সম্পত্তি। ইহাতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকগণের এক চেটিয়া অধিকার। অতি অল্প দিনের মধ্যে মুসলমান লেখকগণ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে আশা করা যায় সে দিন অতি নিকট, যে দিন মোসলেম সাহিত্য হিন্দু সাহিত্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে। উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে সমানভাবে বজায় থাকে, সেদিকে সুধী সমাজের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু মুসলমানের এই সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গলা সাহিত্য যেন একটু উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছে। মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা চালাও।" এই চলিয়া গিয়াছের প্রকৃত অর্থ বুঝা মস্কিল। যে সকল আরবী-ফারসী শব্দ হিন্দু লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিলেন, তাহা হইল চল, আর যাহা বাঙ্গলার মুসলমানগণ ব্যবহার করেন, তাহা হইল অচল। কিন্তু তবুও শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উদার মত সকলে যেন গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েক খানা নামজাদা মাসিকের সমালোচনা পাঠকগণের সম্মুখে পেশ করিতে পারি। মৌলবী নজিবুর রহমান সাহেব তাহার আনোয়ারায় পানি, বরকত, কলেজা প্রভৃতি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রবাসী সম্পাদক তজ্জন্য কঠোর সমালোচনা করিলেন। ইহার পাল্টা জোয়াব অবশ্য কোন শিক্ষিত মোসলেম মহিলা মোহাম্মদী পত্রিকায় দিয়াছিলেন। তিনি প্রবাসী সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত রামায়ণ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে তাহার নিজের

গ্রন্থেই পাণি প্রভৃতি শব্দের ভূরী ভূরী ব্যবহার রহিয়াছে। "আনোয়ারার" আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ইহার অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি—"পুস্তকখানির ভাষা খাটি বাঙ্গলা ভাষা, মুসলমানী ভাষা আদৌ নহে। তবে আপনি (গ্রন্থকার) মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ফার্সী কথাও ব্যবহার করিয়াছেন,—যথা, আম্মাজান (শাশুড়ী), কলেজা (হৃৎপিণ্ড) দুলা মিঞা (জামাতা) বরকত (আয়, উন্নতি) খোস এলহান (সুমধুর স্বর) প্রভৃতি। হিন্দু লেখকগণের নিকট এই সকল শব্দ অবোধ্য হইলেও এই সকল শব্দ ব্যবহার আদৌ অন্যায় হয় নাই; কারণ এই সকল শব্দ মুসলমান সমাজে নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গলা ভাষার এক চতুর্থাংশ আরবী ফারসী হইতে প্রাপ্ত। মনে রাখিতে হইবে যে. বাঙ্গলা শুধু হিন্দুর মাতৃ ভাষা নহে, মুসলমানের মাতৃভাষাও বটে। সেই জন্য মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত দুই একটা আরবী ফার্সী কথা না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়"।

১৩২৭ বাং চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে (পৃঃ—৪৬৯)

দীনেশ চন্দ্রের "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় বলেন—"তাহাদের (মুসলমান রাজগণের) সময়ে যে সকল পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি চিরদিনের জন্য বঙ্গ ভাষার স্থায়ী অংশে পরিণত হইয়াছে। আজিও আমরা "তাকের" উপর "কিতাব" রাখি, 'পিরানের' ছেড়া 'আস্তিন' 'খলিফা' ডাকাইয়া রিপু করিতে দেই। রবি বাবুর কবিতায়ও "বোচকা বোচকি স্থান পাইয়াছে, বাগ বাগিচা বাগানেরত কথাই নাই। বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে—উহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণ—এই সাহিত্যের প্রতি আপনাদের উত্তরাধিকারের দাবী কেন ছাড়িয়া দিতেছেন বুঝিতে পারি না"।

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত "প্রদীপ ও চেরাগের" সমালোচনায় ১৩২৬বাং চৈত্র মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত শর্ম্মা মহাশয় বলেন, "লেখকের ভাষা ভাল—রচনার তেজ আছে, প্রাণ আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুসলমানী বাঙ্গলা বেখাপ্পা বসিয়া সুর কাটিয়া দিয়াছে।" "পবিত্র সাহিত্য মন্দির ম্লেচ্ছ, যবন, অপবিত্র মুসলমানের আরবী ফারবী শব্দের ব্যবহারে অপবিত্র হইল দেখিয়া (সম্ভবতঃ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইবে ভাবিয়া) শর্ম্মা মহাশয়ের মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা বহু মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও মৌলবী সাহেবের প্রদীপ ও চেরাগে এমন শব্দ পাইলাম না, যাহা "বেখাপ্পা" বসিয়া সুর কাটিয়া দেয়"। তবে তিনি আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এই যা অপরাধ। "কদর" "নারাজ" "মশহুর" দোস্ত "খোদা" প্রভৃতি আরবী ফারসী শব্দ মুসলমান নায়ক নায়িকার মুখ দিয়া বাহির করায়, ইহা স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য যদি তিনি কোন হিন্দু নায়ক নায়িকা দ্বারা এই সকল কথা বলাইতেন, তবে ইহা অস্বাভাবিক ও অন্যায় হইত। গ্রন্থকার এই সকল শব্দ ব্যবহার না করিলে উপন্যাসের ভাষা জীবন্ত ও সরস হইত না। উপন্যাসের কাজ সমাজের হুবহু ছবি তুলিয়া দেওয়া। উপন্যাস উপন্যাস। উপন্যাসত স্কুল পাঠ্য পুস্তক নহে। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারও সেই উদ্দেশ্যে পুস্তক রচনা করেন নাই। শর্ম্মা মহাশয়ের আদর্শ যদি বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও সীতার বনবাস হয়, তবে আমরা নাচার। মহাকবি কালিদাস অলঙ্কার শাস্ত্রের কড়া আইন মানিয়া চলিলেও নায়ক নায়িকার কথোপকথনের সময় তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্র নাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্য রথিগণ শত শত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতেছেন কিন্তু যত দোষ নন্দ ঘোষ। যত দোষ মুসলমান নিজ জাতীয় ও ধর্ম্ম ভাষা আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিলে।

আমরা সমালোচক মহাশয়ের মুসলমানী বাঙ্গলা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অর্থ কি? আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কি "মুসলমানী বাঙ্গলা", না, মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বলিয়া? যদি এইরূপ হয়, তবে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া "হিন্দু বাঙ্গলা বা আর্য্য বাঙ্গলা": ইংরেজী শব্দের জন্য ইংরেজী বাঙ্গলা, পালী শব্দের জন্য বৌদ্ধ বাঙ্গলা; পর্ত্তুগীজের—পাদ্রী, সাবান, ফিতা; চীনার—চিনি, সাটিন; আমেরিকার—আলপাকা, হরিকেল; ইটালীর—কামান, পিস্তল; পার্ব্বত্য—কুলা, ধুচনী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নানা ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া—পর্ত্তুগীজ, চীনা, আমেরিকান, ইটালীয়, পার্ব্বত্য বাঙ্গলা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে হরেক রকমের বাঙ্গলা আছে। আর যদি মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বলিয়া "মুসলমানী" বাঙ্গলা হয়; তবে হিন্দু বাংলা, ব্রাহ্ম বাঙ্গলা, খৃষ্টানী বাঙ্গলা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের বাঙ্গলা হইতে পাবে। সুযোগ্য সমালোচক প্রবর অনুগ্রহ করিয়া মুসলমানী বাংলার প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিবেন কি?

আজকাল মুসলমানী বাঙ্গলা বলিলে হিন্দু পাঠকগণের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। আরবী ফারসী শব্দ সমূহ এতই ঘৃণার বিষয়! তাহাদের দেখা দেখি কোন কোন কথা কথিত মুসলমান লেখক ও মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা কোথায় মুসলমান বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিব, তৎপরিবর্ত্তে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেও সঙ্কুচিত হই। ইহাই বাঙ্গলার মুসলমানের অধঃপতনের চরম পরিণতি।

মৌলবি মোজাম্মেল হক প্রণীত "পত্র দলিল লিখন শিক্ষার" সমালোচনায় ১৩২০ বাং আষাড় মাসের (পৃঃ—৩৮৩) প্রবাসী বলেন—"যাহারা বাঙ্গালীর পরিচিত নহে তাহারা একেবারে অপাংক্তেয়, অনাচরণীয়।.........লেখকের নমুনায় পত্র লিখিলে বাঙ্গলা ভাষাকে অপমান করা হয়, তাহার জাত মারা হয়। একটি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

বাঙ্গালী ছেলে তাহার পাড়া গেঁয়ে মাকে পত্র লিখিতেছে :—

জনাব হজরত মওল্লেমা,

শ্রীযুক্তা ওয়ালেদা সাহেবা খেদমতেষু—

হকনাম সহায়—

বখেদমতেষু—

হাজার হাজার আদাব পর আরজ এই যে, আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মধ্যে বাপজীর এক পত্র পাইলাম। তাহাকে আমার হাজার হাজার আদাব কহিবেন খোদার ফজলে ও আপনাদের দোয়াতে আমি ভাল আছি। খোকা মিয়া ভাল আছেন? সত্বর পত্র লিখিয়া সরফরাজ করিতে মর্জ্জি হয়। আরজ ইতি।

খাকছার ফিদ্দবি—গোলাম রহমান।

এ চিঠি ছেলের মা বুঝিতে পারিয়াছিলেনত? না তাহাকে মৌলবীর নিকট দৌড়িতে হইয়াছিল, সে সংবাদ গ্রন্থকার দেন নাই।"

ভদ্র মুসলমান পরিবারের পত্র লিখিবার ইহাই প্রচলিত রীতি ও আদর্শ। বাঙ্গলার সকল স্থানেই এইরূপ পত্র লিখা হইয়া থাকে। সমালোচক মহাশয় বোধ হয় কখনও কোন ভদ্র মুসলমান পরিবারের পত্র পড়িয়া দেখেন নাই। নতুবা এইরূপ লিখিতেন না। তিনি যদি সমালোচনা করার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র মহাশয়ের "প্রবেশিকা রচনা শিক্ষার (Matri culation Bengali composition) "পত্র দলিল শিক্ষা" নামক অধ্যায় বা ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "পত্র দলিল শিক্ষা নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতেন, তবে আমাদের কোন দুঃখ ছিল না। মিত্র মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে :—

তারিখ ও ঠিকানা (হিন্দুদের ন্যায়)

পাঠ—

(ক) পিতা প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিকে—মোবারক জনাবেষু—বহুত বহুত আদাব ও ছলীমাত বাদ আরজ ইত্যাদি।

(খ) মাতা প্রভৃতিকে জুনাবেষু—আদাব তছলীমাত বাদ আরজ ইত্যাদি।

(গ) আশীর্ব্বাদের পাত্রকে—আজিজুল কদর, নুরচশম বহুত বহুত দোয়াপর ইত্যাদি।

নাম সাক্ষর—

(ক) পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের পত্রে—
থাকছার, ফিদ্দবি ইত্যাদি।

(খ) বয়ঃ কনিষ্ঠ আশীর্ব্বাদের পাত্রকে—খয়ের তালেব।

শিরোনাম—

পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে—আরজ দাস্ত বখেদমতে—শ্রীযুক্ত জুনাব—সাহেব পাক জুনাবেষু।

মিত্র মহাশয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার একজন খ্যাত নামা পরীক্ষক এবং তাহার পুস্তকখানা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত তিনি মুসলমান ছাত্রের জন্য উপরোক্ত নিয়মে পত্র লিখার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সমালোচক মহাশয়ের বাজে কথার চেয়ে মিত্র মহাশয়ের কথার মুল্য যে অধিক সে কথা বলাই বাহুল্য। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা করা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়কে একজন প্রবীন সাহিত্যিক ও নিরপেক্ষ সমালোচক বলিয়া জানি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাহার প্রবাসীতে এইরূপ মুসলমান বিদ্বেষ পুর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বাস্তবিকই বড় দুঃখ হয়।

১২৬০ বাং ১লা শ্রাবণের "প্রভাকরে" ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন ইহার অনুকরণে কি সমালোচক মহাশয় বাঙ্গলার মুসলমান সমাজকে পত্র লিখিতে উপদেশ দেন?

ইহার নমুনা এই :—

"পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পরম পিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু :—

সেবকাসেবক শ্রীঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তস্য প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ প্রণত সেবকের সমস্তই মঙ্গল জানিবেন। বিশেষতঃ আপনার মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল ইত্যাদি।

এইরূপ চিঠি ছেলের মা কেন আমাদের মত অসংস্কৃত মুসলমানের পক্ষে সব কথা বুঝিয়া উঠা মস্কিল। এই চিঠি বুঝিবার জন্য মৌলবীর পরিবর্ত্তে পণ্ডিতের নিকটই যাইতে হইবে।

হিন্দু মুসলমান সমাজের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। সমালোচক মহাশয় হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া চক্ষে বিদ্বেষের চশমা পরিয়া মুসলমান সমাজের পত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এ চিঠি ছেলের মা ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন না তাহাকে কোন মৌলবীর নিকট দৌড়িতে হইয়াছিল।" আমরা গ্রন্থকারের পরিবর্ত্তে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া রাখি, এই চিঠির মর্ম্ম উদ্ধারের জন্য কোন প্রত্নতত্ত্ববিধ বা মৌলবী সাহেবের নিকট দৌড়িয়া যাইতে হয় নাই। কারণ এই সকল আরবী ফারসী শব্দ মুসলমান পরিবারের ভদ্র মহিলাত দূরের কথা তাহাদের দাস দাসী পর্য্যন্ত দৈনন্দিন জীবনে শত শত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। যদিও বিজ্ঞ সমালোচক প্রবর মাথা ঘামাইয়া ইহার মর্ম্ম উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

"যাহারা বাঙ্গালীর পরিচিত নহে" ইহার অর্থ কি? যাহারা বাঙ্গলা দেশে বাস করে—হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক তাহারা বাঙ্গালী। কিন্তু প্রবাসীর অভিধানে বাঙ্গালী অর্থে এখানে কেবল হিন্দুকেই বুঝাইয়াছে। মুসলমান বাঙ্গালী নহে, সেত মুসলমান। কেবল প্রবাসীরই দোষ দেই কেন? আজকাল দৈনিক সপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায়, গল্প ও উপন্যাসেও সাধারণ কথা বার্ত্তায় বাঙ্গালী বলিতে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়। কলিকাতার "অমৃত

বাজার "পত্রিকা" ভারতের জাতীয় দলের মুখ পত্র বলিয়া বিখ্যাত ও সম্পাদক মহাশয় নিজকে একজন Nationalist বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। সেই পত্রিকার ১৯২১ইং ২৮শে আগষ্ট সংখ্যায় বলেন— "The audience numbering about 1500 consists of Bengalees; Mohammadans and Marwaris" এখানে বাঙ্গালী (অর্থাৎ হিন্দু) মুসলমান, ও মাড়ওয়ারীর কথা আছে। অর্থাৎ মুসলমান বাঙ্গালী নহে। স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যিনি তাহার প্রিয়তম লেবরেটরী ছাড়িয়া অন্ন সমস্যা ও ভারতের ব্রাহ্মণ শূদ্র বৈষম্য ভাঙ্গিয়া সাম্যবাদ প্রচার করিতেছেন, তিনিও মনের সংকীর্ণতায় প্রবাসীকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারেন নাই। এই যা দুঃখ, ১৩২৬বাং ভাদ্র মাসের প্রবাসীর ৪৮৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন,—"বাঙ্গালীর (অর্থাৎ হিন্দু বাঙ্গালী) যেন প্রতিজ্ঞা ওসব (চামড়া) যেন ছুঁতে নেই। তাই ইংরেজ ও মুসলমান ব্যবসা একচেটে করে রেখেছেন আর ২৫৲ মাহিনায় নৈকুষ্য কুলীনের সন্তান মুসলমান প্রভুর আদেশ মত কোথায় কত চামড়া পাঠাতে হবে নাকে কাপড় দিয়ে কুলির দ্বারা গণিতে দিচ্ছেন।" মুসলমানও বাঙ্গালী কিন্তু রায় মহাশয় মুসলমানকে বাঙ্গালী বলিতে সম্মত নহেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই লাভবান হউক ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। মুসলমানেরা যখন এ দেশবাসী, তাহাদের টাকাত বিদেশে যাইবে না। কিন্তু মুসলমানের লাভে তাহার হিংসা করা কি মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় Sectarian patriotisn নহে?

সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ সঙ্গীতে আছে—

"বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলি ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে।,,

এখানেও ভারতের সাত কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়া উদারতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সাহিত্যে জাতির মনোগত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে হিন্দু ভ্রাতৃগণের মোস্লেম প্রীতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কি হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য এত সাধনা একটা ভুয়া কথা।

প্রবাসী লিখিয়াছেন :—"লেখকের নমুনায় পত্র লিখিলে বাংলা ভাষাকে অপমান করা হয়, তাহার জাত মারা হয়।" মাদ্রাজে যেমন পারিয়া জাতি, আরবী ফারসী শব্দ সকল সেইরূপ বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন উদার হৃদয় সাহিত্যিক এই অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করিলেও সাধারণ হিন্দু-সাহিত্য সমাজ ইহাতে একান্ত নারাজ। যে আরব আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক, যে আরবিক সাহিত্য * হইতে রাশি রাশি শব্দ চয়ন করিয়া ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য উন্নত হইয়াছে, যাহার ছাপ্ এখনও বিশ্ব সাহিত্য মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, সেই আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষার অপমান করা হইল, ইহাতে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের অন্যতম। বাঙ্গলা সাহিত্যেরও যে একটা জাত আছে, এতদিন তাহা আমাদের জানা ছিল না। প্রবাসীর অনুগ্রহে তাহা জ্ঞাত হইয়া আমরা বেশ উপকৃত হইলাম।

বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতৃগণের চক্ষে কি প্রকার হেয়, তাহা নিম্নের কথোপকথন দেখিলেই সহজেই বুঝা যায়।

"যজ্ঞেশ্বরী—এই দিক দিয়ে এসে পাশ থেকে নাও না তুলে? আহা তেষ্টার জল।

পু—গি—ওমা সে কি গো? মুছলমান যে?

য—হলিই বা মা, কাগ বাগের চেয়ে ভাল ত্বো? তেষ্টার জল চায়, মানুষ তাতে বিঘ্ন ঘটালে পাপ হবে যে বাছা—

---

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দের নমুনা দেওয়া গেল :—

الجبرة—algebra=Algebra. لغو—lughu=logic.

اساطير—asatir=History. اصطبل—istabal=Stable

اطلس—atlas=Atlas. الاكسير—aliksir= Eleker.

গু—ংগি—তা বলে মুছলমান জল ছোঁবে? আমরা রইছি ঝাটে? বেশ কথাতো বাবু তোমার?

নারায়ণ—কার্ত্তিক ১৩২৭ বাং পৃষ্ঠা—১১৪২

সুখের ঘরগড়া—শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত।

আমি নিজে নারায়ণের একজন গ্রাহক ছিলাম। নিজের পয়সায় গালি খাওয়া বেশ মজার কথা সন্দেহ নাই। হইতে পারে গ্রন্থকার সাম্যবাদ প্রচারের জন্য একথা বলিয়াছেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাইলেন না—খুজিয়া বাহির করিলেন মুছলমানকে।

উপরের কথায় আর কোন টিকা টিপ্পনীর আবশ্যকতা নাই। ইহাতে আমার মত সমগ্র হিন্দু সমাজের মনোগত ভাব (mentality) প্রতিফলিত হইয়াছে। হে কপট, হৃদয়ে বিদ্বেষের হলাহল চাপিয়া মুখে মিলনের কথা বল কোন সাহসে!

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাহার "সরল বাঙ্গলা রচনা শিক্ষায়" ২৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন—"মুসলমান ছাত্রগণ যেন তাহাদের উর্দ্দু, পার্শি বা আরবী শব্দ ব্যবহার না করে; কারণ তাহা হইলে তাহা কখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত আরও অনেকে এই "বিশুদ্ধ বাঙ্গালার" কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিশুদ্ধ বাঙ্গালার মাপ কাটি কি তাহা বাহির করা বড়ই কঠিন। কোন জীবিত সাহিত্যে বিশুদ্ধ বলিয়া ধরা বাধা কোন শব্দ থাকিতে পারে না। কোন ধর্ম্ম বা জাতিতে যাহা অবিশুদ্ধ অন্য ধর্ম্মে হয়ত বিশুদ্ধ। মূর্ত্তিপূজা হিন্দু ধর্ম্মে বিশুদ্ধ কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তাহা অবিশুদ্ধ। গো মাংস খাওয়া মুসলমান ধর্ম্মে বিশুদ্ধ কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে অবিশুদ্ধ কিন্তু তাই বলিয়া এই বিংশ শতাব্দির উদারতার যুগে জোর করিয়া হিন্দুকে মূর্ত্তি পূজা করিতে বা মুসলমানকে গরু খাইতে নিষেধ করা অসম্ভব ও সভ্যতা বিরুদ্ধ।

ধর্ম্মে বা জাতিতে যে নিয়ম, সাহিত্যেও সেই নিয়ম খাটে। আরবী ফারসী শব্দ শাস্ত্রী মহাশয়রা তাহার মতানুযায়ীদের নিকট অবিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলার মুসলমানের নিকট তাহা বিশুদ্ধ।

"বিশুদ্ধ বলিয়া কোন মাপ কাটি আমাদেয় সাহিত্যে থাকা সম্ভবপর নহে। আজ যাহা (slang) বা অসাধু কাল তাহা সাহিত্য সমাজে প্রচলিত হইবে। বিশুদ্ধি বিচারের পূর্ব্বে বিশুদ্ধি কাহাকে বলে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। সাহিত্যের ভাষাতে ও কথা বার্ত্তার ভাষাতেও আছে। এই সকল শব্দ খাটি সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু এই সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও অনেক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান, এগুলিকে খাটি বাঙ্গলা শব্দ বলা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ বাঙ্গলা ভাষার শরীরে অস্থি মজ্জায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহাদিগকে বর্জ্জনের উপায় নাই। বাঙ্গলা লিখিতেই হউক আর বলিতেই হউক, ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই।" (শব্দ কথা—ত্রিবেদী)

শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক: "কথনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইবে না "র" ১৪৪ ধারা জারি করিয়া মুসলমান ছাত্রের আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা পরীক্ষক এবং তাহার পুস্তক যখন পরীক্ষার্থীগণের উদ্দেশ্যে লিখিত তখন তাহার মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নন-অফিসিয়েল অভিমত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস জন্মে। তিনি যদি এইরূপ করিলেন, তবে মুসলমান ছাত্র দাঁড়ায় কোথা? হিন্দু ছাত্র তাহার সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করায় তাহা হইল বিশুদ্ধ "বাঙ্গালা" আর মুসলমান ছাত্র তাহার আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করায় তাহা হইল অবিশুদ্ধ। মুসলমান ছাত্র হিন্দু পরীক্ষকের মন তুষ্টির জন্ত বা নম্বর কাটা যাইবার ভয়ে স্বীয় জাতীয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া আল্লা

না লিখিয়া ভগবান ও জগদীশ্বর লিখিয়া থাকে, যাহারা খুব চালাক তাহারা জগতপাতা প্রভৃতি দ্বারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বিপদ এড়ায়। একথা আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জানি।

১৯২০ইং ২১শে মার্চ্চ "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মোস্‌লেম লীগের" (যশোহর) সভাপতির অভিভাষণে মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বলিয়াছেন—

(University Page 34) while I was leaving, Sir Ashutosh came with me up to the door of the hall and putting his hand upon my shoulder said, "you will see what a Hindu does for the Mussalmans" সার আশুতোষের এ কথার উপর নির্ভর করিয়া ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হওয়ার সময় আমরা অনেকটা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ যাহা দাবী করিয়াছিলেন তাহার একটিরও পূরণ হয় নাই। তাই কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষপাতিত্বে আমাদের সত্যই মনে হয়, যেন মুসলমান ছাত্র তাহার সতীনপুত্র।

আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া দুই জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উদার অভিমত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার অভিমত জানিতে চাহিলে পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখকের নিকট ১৯১৮ইং ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে যে পত্র দিয়াছিলেন নিম্নে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আরবিক, পারসীক ও উর্দ্দু ভাষা হইতে ভাব ও শব্দ সংগ্রহ না করিলে বাঙ্গলা ভাষা কখনও পুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না।

বাঙ্গলা ভাষা শুধু হিন্দুর মাতৃ ভাষা নহে, ইহা মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলেরই মাতৃভাষা। যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বার্ত্তা বলেন তাহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য এই যে তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেন। বাঙ্গলা ভাষা সংকীর্ণ হইলে উহার কখনই উন্নতি হইবে না।

১৩২২ বাঙ্গলার বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন মনযোগ সহকারে সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি বলেন :—"সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিষ লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিষ বাঙ্গালার হাড়ে মাংসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে যেমন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেইরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গালার বিভক্তি "রা" ও "দের" মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তুলিয়া দিবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী শব্দ" ব্যবহার করিবেন, অথচ লেখনীর অর্থ উড়েদের তাল পাতায় আচড় কাটিবার লোহার খন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" একেবারে বিভিন্ন জিনিষ। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না, মস্যাধার লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা পাট্টা লিখিবে না "ভোগ বিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত লিখিবেন না, লিখিবেন বিচারালয়। এইরূপ তাহারা বাঙ্গালাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিতে চান তাহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।"

মুসলমানী বাঙ্গলা

ও
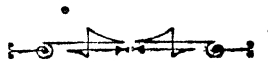
মুসলমান সমাজ।

মুসলমানগণেরই মধ্যে অনেকে হিন্দু লেখকগণের অনুকরণে স্বীয় জাতীয় সাহিত্য গড়িবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহারা 'নমাজ' না লিখিয়া উপাসনা রোজার পরিবর্ত্তে উপবাস, আল্লার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর বা ভগবান, বেহেস্ত-দোজখের জায়গায় স্বর্গ নরক, মসজিদের বদলে মন্দির বা উপাসনালয় লিখিয়া থাকেন। কিন্তু এক জাতি বা ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে ইহার তেজ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী শহীদুল্লা সাহেব দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে বলেন:— "মুসলমানী বাংলায় কটমট বুলি, বাঙ্গালার হিন্দুর কাণে স্থান পাইবে না, অন্তরেত নয়ই। খোদা, পয়গম্বর, বেহেস্ত দোজখ, ফেরেস্তা, নমাজ, রোজা, প্রভৃতি ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন?

১৩২৬ বাং আশ্বীন মাসের আল-এসলামের ৩১১ পৃষ্ঠায় মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বনাম বঙ্গীয় মুসলমান নামক প্রবন্ধে বলেন—"মুসলমান সাহিত্য বলিতে আমরা "দোভাষী মুসলমান সাহিত্যের" কথাও বলিলাম, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। দোভাষী বাংলা কোন শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে। সুতরাং তাহাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করাও অন্যায়।........আমরা চিরকাল বিশুদ্ধ বাঙ্গালার পক্ষপাতি"

আমি দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখকের রচনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। ইহাতে আমাদের আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকগণের আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে মনের ভাব কিরূপ তাহা বুঝা যাইবে। কোন হিন্দু লেখক এইরূপ লিখিলে আমাদের দুঃখ ছিল না, কিন্তু মুসলমানেরা যখন নিজেরাই নিজের মাথায় কুড়াল মারিতেছে, নিজেই নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও জাতীয় শব্দগুলি সাহিত্য রাজ্য হইতে ভিটাচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর তখন ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মুসলমানী বনাম দোভাষী বাঙ্গলায় কথা শিখিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই ভাষায় কথা বলিয়া থাকি। এই ভাষাই আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভাষা। কিন্তু আজ আমরা "শিক্ষিত লোক" হইয়া আরবী ফারসী মিশ্রিত সাহিত্যকে মুসলমানী বাঙ্গলা, দোভাষী বাঙ্গলা প্রভৃতি মধুর শব্দে আপ্যায়িত করিয়া তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হই না বা ইহাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে লজ্জা মনে করি। ইহাই আমাদের অধঃপতনের চরম পরিণতি। যে জাতি স্বীয় মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার প্রতি গৌরব বোধ না করিয়া বরং তাচ্ছিল্য করে, সে জাতির পতন স্থির নিশ্চয়। আধুনিক ভারতের এই অধঃপতন বিজাতীয় অনুকরণ প্রিয়তা নহে কি? আইরীশ জাতীর এই পতন তাহাদের ইংরেজী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা নহে কি? তাহারা ইংরেজ সাজিতে লালায়িত হইয়া নিজ মাতৃ ভাষা গেলিক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। এক সময়ে স্কচ জাতির এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাহিত্য ও সভ্যতা ছিল। কিন্তু প্রবল ইংরেজের চাপে পড়িয়া তাহাদের সাহিত্য ও সভ্যতা এখন লুপ্ত। প্রবলতর জাতির সংঘর্ষে পড়িয়া কত জাতি ও কত ভাষা যে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে বা ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজ আরবী ভাষার সেই দুনিয়া জোড়া প্রভাব কোথায়? তাহার স্থান ইংরেজী ভাষা দখল করিয়া ফেলিয়াছে। আজ আর এশিয়ার গৃহে গৃহে পারস্য কবিগণের সুমধুর গজল গীত হইতে

শুনা যায় না। আজ আর ল্যাটিন সাহিত্যের সেই গৌরব নাই। আজ প্রাচীন মিশরীয় ফিনিশিয়া, বেবিলনের সভ্যতা ও সাহিত্য কোথায় লুক্কায়িত আছে, ঐতিহাসিকগণ ইহার কোন কুল কিনারা করিতে পারেন নাই। মুসলমান, তুমি কি নিজ মাতৃভাষা জাতীয় ও ধর্ম্ম ভাষা ভুলিয়া গিয়া ধরা হইতে লুপ্ত হইতে চাও? এখনও সময় থাকিতে কি তোমার মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবে না?

আমাদের নবীন সাহিত্য-সমাজ আরবী ফারসী মিশ্রিত "কটমট মুসলমানী বুলি ও দোভাষী বাঙ্গলা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। এখনও দুনিয়ায় আরবী ভাষার কতখানি প্রভাব আছে, তাহা "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার" ১৩২৬ বাং কার্ত্তিক সংখ্যার ২৪১ পৃষ্ঠায় মৌলবী মোজফফর আহমদ সাহেবের "আরবী ভাষা" নামক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন :—

"ইংরেজী ভাষাকে বাদ দিলে বিশ্বময় বিস্তৃতি কিম্বা মানব জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে একমাত্র আরবী ভাষাই আর সকল ভাষাকেই পরাস্ত করিয়াছে।

* রেভারেণ্ড জি, ই, পোষ্ট এম, ডি, (Rev Geo, E. Post M. D.) জ্ঞান তিনটি জিনিষে অবতীর্ণ হইয়াছে,—ফিরিঙ্গি জাতির মস্তিষ্কে, চীনাদের হাতে, এবং আরবী জাতির ভাষায়।

---

* রেভারেণ্ড, এস, এম, জুয়েমার (Rev S. M. Zwamer F. R. G. S. প্রণীত Arabia :—The cradle of Islam নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। মুসলমানের আপনার বলিতে যা কিছু আছে সমস্তেরই দোষ প্রদর্শন করিতে এই পাদ্রী পুঙ্গব জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ইসলাম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ বলিয়া বঙ্গের গভর্ণমেন্ট তাহার "ইসলাম" নামক গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু জুয়েমারের ন্যায় ব্যক্তিও আরবী ভাষা সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাহা আমাদের স্কলারদের চোখের সামনে ধরার জন্য এই টুকু সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(সঙ্কলক)

(সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ মোহাম্মদ আদ্দমির) দুইটি ধর্ম্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে—খৃষ্টধর্ম্ম ও ইসলাম। দুইটি জাতি (race) কৃষ্ণ মহাদেশ (আফ্রিকায়) অধিকার লাভ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে—এংলো স্যাক্সন ও আরব। উপনিবেশ স্থাপন ও প্রচারের ভিত্তির উপর বিশ্বময় বিস্তৃতির জন্য দুইটী ভাষা অতীতের যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া প্রতিযোগিতা করিয়াছে—ইংরেজী ও আরবী। আজ প্রায় সাত কোটি লোকের মাতৃ ভাষা আরবী এবং প্রায় ততোধিক লোক কোর-আনের ভাষার কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছে; কেন না তাহারা মুসলমান। পূর্ব্বাকাশ উষার রক্তিমচ্ছটায় চিত্রিত হওয়ার পূর্ব্বেই ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে কোরআনের প্রথম অধ্যায়ের আবৃত্তি হইয়া থাকে। তারপর পেকিনের মুসলমানগণের নমাজে ও সমস্ত চৈনিক ভূখণ্ডে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। ইহা হিমালয়ের অন্তর্দ্দেশ ও পামিরের মাল ভূমিতেও পরিশ্রুত হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে পারস্যবাসীগণ এই আরবী শব্দ গুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তৎপর সমগ্র আরব উপদ্বীপে বিশ্বাসীদিগের প্রতি নমাজের জন্য মোয়াজ্জিনের উচ্চ আজান ধ্বনি উত্থিত হয়। আবার "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিত হয় নীল নদের জল রাশির উপরে। তার পর এই আরবী বাক্যটী পশ্চিমাভিমুখে ক্রমশঃ সুদান, শাহারা, ও বর্ব্বর রাজ্য সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া পরিশেষে মরক্কোর মসজিদ সমূহ বিলীন হইয়া যায়।

আরবী কোরআন তুরস্ক, আফগানিস্থান, যাবা, সুমাত্রা, নিউগিনি, এবং দক্ষিণ রুশিয়ার বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যরূপে অধীত হইয়া থাকে। আরবী ভাষা কেবল নিজ আরবে কথিত হয় না, পরন্তু আরব উপদ্বীপের ভাষার সীমানা বাগদাদের ৩০০ মাইল উত্তরে দিয়ারেবকর ও মার্দ্দিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিরিয়া, প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় আরবী ভাষাই কথিত হইয়া থাকে। এমন কি কেপ কলনিতে পর্য্যন্ত মোহাম্মদের ভাষার নিয়মিত পাঠকের অভাব নাই। অতি প্রাচীন সময় ১৩১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপের বিশ্ব

বিদ্যালয় সমূহে পাদ্রী রেমণ্ড লাল Raymund Lull এর কল্যাণে আরবী ভাষা অধীত হওয়া হইয়াছে। আর আজ কায়রো অপেক্ষা লিডেনেই Leiden যথাযথরূপে আরবী ভাষার শিক্ষা হইতেছে। সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আরবী সাহিত্যের গবেষণা হইতেছে ক্যাম্ব্রিজে—দামেস্কে নহে।

আরবী ন্যায় ভাষা আরবের মরু প্রদেশে উদ্ভূত হওয়ায় এবং যাযাবর জাতির শিবিরে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে সেমেতিক ভাষা সমূহের সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত, আরনে রেঁনা Ernest Renen আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছেন যে—"সেমেতিক ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী ভাষা কি শব্দ সম্পদে, কি বর্ণনা মাধুর্য্যে কি উহার লজিকের ভিত্তির উপর সূত্র গঠনে আর আর সকল ভাষাকে অতিক্রম করিয়াছে।"

ভাষা জাতীয় জীবনের প্রাণ স্বরূপ। যে জাতির জাতীয় ভাষা নাই সে জাতির প্রাণ নাই। আরবী ফারসী শব্দ মুসলমান সমাজের প্রাণ। আরবী মুসলমানের ধর্ম্ম ভাষা। ফারসী ধর্ম্ম-ভাষা না হইলেও মুসলমান ধর্ম্মের হাদিস, তফছির, ফেকা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ গুলি ফারসী ভাষায় লিখিত, এবং মুসলমান ধর্ম্ম বুঝিতে অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে বিশেষতঃ মুসলমানেরা ভারতে সাত শত বৎসর রাজত্ব করার পর আরবী ফারসী সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও শব্দ সকল মুসলমান সমাজের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। আরবী ফারসী শব্দ সকল মুসলমান সমাজের রক্তে পরিণত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। নমাজের পরে মোনাজাত করিবার সময় মনে মনে কোন বিষয় চিন্তা করার সময়, নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিবার সময়, বন্ধু বান্ধব বা পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন সুখ দুঃখের কথা জানাইবার সময়, আমরা আরবী ফারসী মিশ্রিত দোভাষী কট্‌মট মুসলমানী বাঙ্গলা ব্যবহার করিয়া থাকি। শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলে মানুষ যেমন ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়, বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে আরবী ফারসী শব্দ উঠাইয়া দিলে আমাদের জাতীয় জীবনও তেমনি নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যাইবে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ রাখা তিনটি কারণে একান্ত দরকার। প্রথম মুসলমানের ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনের জন্য; দ্বিতীয়—রাজনৈতিক কারণে এবং তৃতীয়—সাহিত্যে উন্নতি সাধনের জন্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শব্দের কথা উপরে কিছু আভাষ দেওয়া হইল এবং পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইবে।

বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানকে কেবল বাঙ্গলার চৌহদ্দীর ভিতরে আটকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের উপর বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্যের নাম—দেশ বিদেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া। মধ্য এশিয়ার শিক্ষিত সমাজের ভাষা এখনও ফারসী প্রচলিত আছে। আমাদের প্রতিবেশী পারস্যের মাতৃভাষা ফারসী; আফগানিস্থানের মাতৃভাষা ফারসী না হইলেও ইহা তথাকার রাজকীয় ভাষা ও শিক্ষিত সমাজের ভাষা। আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া, বসরা, বোগদাদ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের মাতৃভাষা আরবী। মিশর ও অধিকাংশ আফ্রিকা বাসীদেরও মাতৃভাষা আরবী। এই সকল দেশের সহিত তেজারত কারবার ও ভাবের বিনিময়ের জন্য আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষা করা যেমন দরকার; বাঙ্গালা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ রাখা সেই কারণে আবশ্যক। ইউরোপের বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহে প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; আমাদের সেইরূপ একটা নিয়ম করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। এখন আমরা একঘরে হইয়া থাকিতে পারি না। এখন সমগ্র বিশ্বজগত একটা বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইয়াছে এই বিশ্ব পরিবারের পরস্পরের খোজ খবর লইতে হইলে একমাত্র বৈদেশিক ভাষার সাহায্যেই সম্ভবপর। তাই বলিতে চাই, বিভিন্ন দেশবাসীর সহিত, বিশেষতঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সহিত ভাবের মিলনের একমাত্র সেতু বন্ধন হইতে আরবী ফারসী ভাষা ও শব্দের মধ্য দিয়া।

যে ভাষা যত উন্নত তাহার ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ রাশিও তত প্রচুর থাকে। বাঙ্গলা দেশে এমন কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে, যাহাদের এখনও সাহিত্য সমাজে চল চল হয় নাই (যদিও কোন কোন উদার পন্থীরা ইহাদের untouchability অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করিতেছেন) তাহারা সাহিত্যের জাত না মারিয়া বরং ইহাকে সতেজ করিবে। এবং ভাব প্রকাশের শক্তি বর্দ্ধিত করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নেহাত, খেয়াল, মেজাজ, গরজ, প্রভৃতি ফারসী শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় নাই। ইহারা এমন সুন্দর ভাব প্রকাশ করে যে, তদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। দরবার শব্দটির যে জমকালো ভাব ও ধুমধাম প্রকাশিত হয়, রাজ সভা দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় না। কুচ-কাওয়াজ হামলা-ছাউনি, সেপাই, বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ভাষা সতেজ হয়। মুসলমানের দোয়াত কাগজ কলম না হইলে আমাদের সাহিত্যিক-গণ আর সাহিত্য আলোচনা করিতে পারিবেন না। মুসলমানের উকিল মোক্তার, মামলা-মোকদ্দমা, আসামী, ফরিয়াদিকে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

অনেকে মনে করেন, "প্রাচীন সংস্কৃত রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূণ্য হইবার নয়।" এই অন্ধ জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা বাঙ্গলা ভাষার অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। জাতীয়তা একটা ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন উহ এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন উহা বদ্ধ পুকুরের পচা জলের ন্যায় দুর্গন্ধময় হইয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের হানীকর হইয়া উঠে।

ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৩২৮ বাং আশ্বিন মাসের "মানসী ও মর্ম্ম বাণীতে" "প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমল কান্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বন্দুক, কামান, ও বারুদের প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছেন—

"শতঘ্নী, ভূষণ্ডী, অগ্নীচূর্ণ"। এই সংখ্যার "প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার" নামক প্রবন্ধ লেখক বলেন—"যখন পাদুকা ছিল, তখন পদাতপ মোজাও ছিল।" এই প্রকার অনুমান আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া রিসার্চ্চ করায় কোন ফল নাই। সমগ্র বাঙ্গলা দেশ যখন এই সকল অজাত মুসলমানী শব্দ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, তখন ইহার পরিবর্ত্তে নানা আবর্জ্জনা দিয়া বাঙ্গলা ভাষার জঞ্জাল বাড়াইবার কি আবশ্যক আছে বুঝিতে পারি না। তাই শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় বাস্তবিকই বলেন—"যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গলা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।"

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা, নিজের জাতীয় ভাব ফুটাইয়া তোলা। আরবী ফারসীর পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে কি সে কাজ সম্পন্ন হইবে? কঠিন শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়া বা বিপদ আপদ ঝড় তোফানের সময় "আল্লা" "আল্লা" বলিয়া আমরা মনে যে শান্তি পাই, ভগবান বা ঈশ্বর বলায় কি তাহা হয়? (এখানে আমি অমুসলমানদের কথা বলিতেছি না)। আমাদের আরবী ফারসীর কটমট বুলি হিন্দু কানে বা অন্তরে পৌছুক বা না পৌছুক, তজ্জন্য আমরা কোন তোয়াক্কা করি না। এখন আমরা কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে বা কঠোর সমালোচনায় ভীত নহি। তাই আমরা দেখিতে পাই শত বাধা সত্বেও মুসলমানেরা সাহসের উপর ভর করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। তাই আজ বাঙ্গলা সাহিত্যে "আবে হায়াত, নাজাত আলইমান, নেয়ামত, সওগাত" প্রভৃতি পুস্তকেও আরবী ফারসী শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাই নিজের জাতীয়তায় জলাঞ্জলী দিয়া হিন্দু ভ্রাতৃগণের মন যোগাইয়া আমরা সাহিত্য গঠন করিতে পারি না। আমরা হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রত্যাশী, কিন্তু মাথার টুপী ফেলিয়া কপালে সিন্দুর পরিয়া হিন্দুবেশে তাহাদের সহিত মিলিতে পারি না। আমরা চাই মিলিতে নিজে মুসলমান থাকিয়া, নিজে ইসলামিক ভাব ও মুসলমানিত্ব বজায় রাখিয়া।

মৌলবী শহীদুল্লা সাহেবের কথামত মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শব্দগুলি আরবী ফারসীর পরিবর্ত্তে সংস্কৃত হইলে আমাদের কি আপত্তি আছে, তাহা মৌলবী আকরম খান সাহেবের অভিভাষণ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম তিনি বলেন—"মুছলমান বিজয়ের পর পূর্ব্বের পারস্য ও পারসী ভাষা এসলাম ধর্ম্ম ও আরবী ভাষার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তথায় এক অভিনব জাতি ও অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ......মুসলমান প্রভাবের ফলে পারস্যের যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। পারস্য আরবের কতকগুলি শব্দ লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরবী ভাষা ও আরবের ধর্ম্ম শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। সাধারণ ভাবে বহু আরবী শব্দ পরিপূর্ণ নূতন পার্শীর ব্যবহার থাকিলেও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির শিক্ষা আরবীর মধ্য দিয়াই প্রদত্ত হইত। তাই আমরা দেখিতে পাই কোর-আনের টীকাকার বা মোফাচ্ছেরেনগণ, হাদিছের সংগ্রাহক বা মোহাদ্দিছিনগণ, ইতিহাস ও অভিধান রচয়েতৃগণ, তছাউফের সাধক ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থকারগণ, ফেকাহ, অছুল আকায়েদ এমন কি আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থকারগণ—প্রায় সকলেই পারস্যবাসী।

এ অবস্থায় পারস্যের মুসলমান যাহা করিয়াছিল, বাঙ্গালার মুসলমানের তাহা করিতে পারা সম্ভবপর নহে। সেখানে পারস্যের প্রাচীন ভাষা, এমন কি বর্ণমালা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। তাহারা ধর্ম্ম সংক্রান্ত আরবী পরিভাষার যে প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছিল, যে অর্থে, যে ভাবে এবং যে বৈশিষ্টে যে শব্দের ব্যবহার করিয়াছিল, সেই শব্দের দ্বারা তাহার বিপরীত অর্থ, ভাব ও বিশিষ্টতা বুঝিবার মত একটা প্রাণীও পারস্যে ছিল না। কিন্তু এখানে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য ও ঐ পরিভাষাগুলি এসম্বন্ধে নানাপ্রকার পাকাপোক্ত পৌত্তলিক ভাবপোষণ করিতেছে। আড়াই কোটী মুসলমানের নূতন তৈয়ারী অর্থ ২২ কোটি হিন্দুর শত শত যুগের বিশ্বাস, সংস্কার ও ব্যবহারের চাপে কয়দিন বাচিয়া থাকিতে

পারে ? তখন ঐ শব্দের ব্যবহার কিন্তু—নিজের আসল অর্থ সহ—মুসলমানদের মধ্যে চলিয়া যাইবে।”

খোদা, পয়গম্বর, বেহেস্ত, দোজখ, ফেরেস্তা, নমাজ, রোজা প্রভৃতি ফার্সি হইলেও সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহারা ইসলামিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা বাঙ্গলার মুসলমানও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ঈশ্বর, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আমাদের খুব আপত্তি আছে। এক জাতির ভাষা ও শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে সেই শব্দের তেজ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় এবং অর্থ বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের নমাজ, রোজা, হজ্ব জকাত প্রভৃতি শব্দ টেকনিকেল technical ইহাদের প্রতিশব্দ অন্যত্র পাওয়া যায় না। নমাজের অনুবাদ উপাসনা কোন প্রকারে চলিলেও —ফরজ, ওয়াজেব, মোস্তাহাব, নফল, বকা'ত প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ কি হইবে? বৈদিক সাহিত্য বা সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিলেও ইহাদের কোন প্রতিশব্দ বাহির করা সম্ভবপর নহে। নমাজের প্রতিশব্দ উপাসনা হইতে পারে না। নমাজ বলিলে আমরা বুঝি—যে উপাসনা খাস আল্লাহর জন্য করা যায়। কিন্তু উপাসনা কত প্রকারের হইতে পারে—সূর্য্য উপাসনা, চন্দ্র উপাসনা, তান্ত্রিক উপাসনা, ব্রাহ্ম উপাসনা, খৃষ্টান গির্জ্জার উপাসনা প্রভৃতি। নমাজ কিন্তু সেই রূপ কোন প্রকারের উপাসনাই হইতে পারে না। মুসলমানেরা আল্লার উদ্দেশ্যে যে উপাসনা করে তাহাই হইল—নমাজ। রোজা ও উপবাসের সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। রোজার দিন—সূর্য্যোদয় (ছোবেহ ছাদেক) হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কেহই ভাত, জল, তামাক, পান ইত্যাদি কোন প্রকারের খানাপিনা করিতে পারে না। কেন না এইরূপ করা সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ভাত না পাইয়া যে উপবাস করা হয় তাহাও উপবাস। একাদশীর উপবাস ও অন্যান্য উপবাসের সময় হিন্দু ধর্ম্মে কলা খাওয়া, জল ও দুধপান অথবা গুনগান করা তত নিষিদ্ধ নহে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ ছোট ছোট

খাওয়া দাওয়া খুব চলে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দির উদার যুগেও রোজা রাখিয়া জল খাওয়া ও ধুমপানে পানের ফতোয়া দিতে কেহ সাহস করিবেন না। রোজা ও উপবাসের অর্থ একই ভাবে ব্যবহৃত হইলে বেহেস্তে যাইবার পথ কি সোজাই হইত! মসজিদের অনুবাদ মন্দির দ্বারা হইতে পারে না। পূজার মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়া অহিন্দুবত কথাই নাই, সাধারণ অব্রাহ্মণ হিন্দুবও প্রবেশের অধিকার নাই। সেখানে পুরোহিত ছাড়া আর দুই এক জনের জায়গা কোন প্রকারে হয়। কিন্তু আমাদের মসজিদে উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সকল মুসলমানই যাইতে বাধ্য। ইহা কেবল উপাসনালয় নহে, ইহা মুসলমান সাধারণের একটা ডেমক্রেটিক পার্লামেণ্ট। ইহাতে ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজিক অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। হজ্বের পরিবর্ত্তে তীর্থ ভ্রমন হইতে পারে না। মক্কা ও মদিনা শরিফে গিয়া কাবাশরিফ ও হজরতের মজারশরিফ জিয়ারত করা এবং অন্যান্য ধর্ম্ম পদ্ধতি সম্পাদন করার নামই হজ্ব। এই হজ্ব সম্পাদন করা প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের পক্ষে ফরজ। অন্য কোন অলি দরবেশের মজারে গিয়া কবর পূজা করা ইসলাম-বিরুদ্ধ কাজ। আমাদের জন্য কতকগুলি পবিত্র স্থান—জায়েমকদ্দছ—আছে—কিন্তু তীর্থ স্থান নাই। ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী। জকাতের অনুবাদ কর প্রদান বা ভিক্ষা প্রদান দ্বারা হইতে পারে না ইসলামের বিধান অনুযায়ী সঞ্চিত আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বয়তোলমাল বা সাধারণ হিতকার্য্যে দান করাই জকাত। ইহা ইসলামের পাঁচ ফরজের অন্যতম। এই সকল আরবী ফারসী শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ গুজামিল দিয়া কোন প্রকারে চালাইলেও আল্লার অনুবাদ ঈশ্বর বা ভগবান দ্বারা কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

অনেক ইংরেজী শিক্ষিতেরা মুসলমানকে মোহামেডান ও ইসলামকে মোহামেডানইজম্ বলেন ও লেখেন। ইহার বাঙ্গলা তরজমা করা হইয়াছে, মোহাম্মদীয় যথা—মোহাম্মদীয় আইন। ইংরেজ পাদ্রীরা ইসলাম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নামের আকারে এই শব্দের প্রচলন করিয়াছেন।

যেমন মহাপুরুষ যিশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের নাম রাখা হয়—Christianity ও Budhism. কিন্তু এরূপ করা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা মোহামেডান নহি, আমরা মুসলমান এবং আমাদের ধর্ম্মের নাম ইসলাম। কোন কৃত্রিম মানুষের গড়া নাম ইহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আল্লাহতালা নিজেই পবিত্র কোরআনে ইহার নাম দিয়াছেন—

ان الدين عند الله الاسلام

"শব্দ কল্পদ্রুম" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানের ১৯৩ পৃষ্ঠায় ঈশ্বরের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আল্লার প্রতিশব্দ কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। প্রকৃতিবাদ অভিধানের ২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"ঈশ্বর—(ঈশ্ আধিপত্য করা—বর—ক, শীলার্থে) সং পুং শিব। (দক্ষিণাত্যে শিবই ঈশ্বরের প্রতিপাদ্য) বায়ু পুরাণ মতে—ঈশ্বর একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন। ২। ব্রহ্ম। ৩। কন্দর্প। পাতঞ্জল মতে—ক্লেশ, জন্ম, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য। দদামিচ সর্ব্বৈশ্চর্য্য মীশ্বর চেস্তন কীর্ত্ত্যতে। ৬। বিং, ত্রিং অধিপতি স্বামী, প্রভু। ৭। শ্রেষ্ঠ। ৮ সমর্থ। (বা, বি, স্ত্রী, দুর্গা। শিং—১"ঈশ্বরী মেশ্বরী প্রিয়াম। ২। লক্ষ্মী। ৩। সরস্বতী। ৪। যে কোন শক্তি ৫ যোগিনী বিশেষ। ৩। লিঙ্গিনী বৃক্ষ। ৭। বন্ধ্যাক কোটকী বৃক্ষ। ৮। রুদ্র জটলতা। ৯। লাকু লিকন্দ। শিং—"রাজ্যে কপি মহারাজা মাং বাসন্নিতুমি শবঃ। ৩। ঈশ্বরাণাং যত্র নৃত্যাদিকং, ভবতি সা সঙ্গতিশালা। ভগবানের অর্থও এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।

আপনারা এখন বিচার করিয়া দেখুন, আল্লার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর বা ভগবান প্রচলিত হইতে পারে কি না? শিব আল্লা নহেন; একাদশ রুদ্রের মধ্যে এক জন আল্লা নহেন; লিঙ্গিনী বৃক্ষ বা লক্ষ্মী, সরস্বতীও আল্লা নহেন। আল্লা বলিতে আমরা বুঝি যিনি দীন দুনিয়া তামাম আছমান জমিনের মালীক। যিনি لم يلد ولم يولد — যিনি في السموات والارض

কাহারও ঔরষে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং যাহা হইতে কেহ জন্মে নাই। যিনি আজল হইতে আবদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন ও থাকিবেন—তিনি আল্লা। ১৩২৫ বাং জ্যৈষ্ঠ মাসের আল-এসলামের ১০৮ পৃষ্ঠায় সুরা ফাতেহার তফছীর বর্ণনায় মৌলবী আকরম খান সাহেব বলেন :— الله (আল্লাহ) :—

আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় খুজিয়া পাওয়া সম্ভব কিনা বলিতে পারি না! বাংলার ঈশ্বর=(ঈশ—বর) একেবারেই চলিতে পারে না। সেখানে আবার ঈশ্বরী আছেন। কারণ ছোট বড় এখানে নাই। পার্শীর খোদাও আল্লার প্রতি শব্দ নহে কারণ মানুষের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়, যেমন কাৎখোদা না-খোদা, খোদাওন্দ ইত্যাদি। ইংরেজী (God) গড এরও ঐ দুর্দ্দশা। আবার এই সকল শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচনও আছে। কিন্তু আল্লাহ শব্দে ঐ সকল ত্রুটি নাই। তাহার দ্বিবচন; বহু বচন বা স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদি হয় না। এবং একমাত্র "সমস্ত পূর্ণ গুণের আধার—নিশ্চিত সত্বা"।

الوجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال

মহাশক্তি ব্যতীত কোন সময় এবং কোন অবস্থায় আর কাহারও প্রতি ঐ শব্দটির প্রয়োগ হইতে দেখা যায় না। এমন যে ঘোর পৌত্তলিক প্রাচীন আরব জাতি, তাহারাও আপনার কোন প্রতিমা বা ঠাকুরকে ঐ নাম দিতে সাহসী হয় নাই। আল্লাহ আল-ইলাহ শব্দের সংক্ষিপ্ত এ কথা বলা ভুল।"

মুসলমানেরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আরবী তাহাদের ধর্ম্ম-ভাষা—প্রাণের ভাষা। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া রক্তে পরিণত হইয়া ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হয়। সেইরূপ আরবী ফারসী শব্দও যুগ যুগান্তরের স্মৃতি বহন করিয়া মুসলমান সমাজের রক্ত মাংসে জড়িত হইয়া প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি সেই তেরশত বৎসরের "হাবুল মতিনের" সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে কি করিয়া?
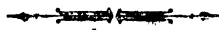
মোসলেম জাতীয়জীবনে

বাংলা সাহিত্যের প্রভাব।

জাতীয় জীবনের সহিত সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একথা ইতিহাস যুগে যুগে প্রমাণ করিয়া দেয়। আমাদের আধুনিক মুসলমান সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অভাব। আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য আলোচনা করিলে সে কথারই সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ও মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের যে লম্বা লিষ্ট দিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। সাহিত্য বিশারদ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে এইরূপ একটা গানের নমুনা দিলাম।

রাগ কেদার।

রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু।
ব্রহ্মা যারে স্তুতি করে চারি বআনে।
পুষ্প চন্দন লৈআ গোপী সব ধাএ।
মেলি মেলি মারে পুষ্প গোবিন্দের গাএ॥
পুষ্প চন্দনের ঘায় জর্জ্জরিত হরি।
মাধবী লতার তলে লুকাএ মুরারী।
শ্রীকৃষ্ণ বলিআ গোপী কান্দিতে লাগিলা
মির ফয়জোল্লা কহে অপরূপ লীলা।
শ্যাম রূপ দরশনে দরবে এ শিলা।

মুন্সী সাহেব ইহাদিগকে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" না বলিয়া "বৈষ্ণব পদাবলী লেখক মুসলমান কবি বলিয়া দীনেশ বাবুর সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন:— "রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া প্রেম কবিতা রচনায় সকল পিপাসা মিটান যায়। এজন্য বোধ হয় তাহারা রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে আদর্শ করিয়াছিলেন সাংসারিক দৃষ্টিতে আমি ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বুঝি না। কেহ কেহ বলেন উপাস্যকে কৃষ্ণ ও উপাসককে রাধা কল্পনা করিয়াই তাহারা রূপকচ্ছলে এরূপ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।" মুন্সী সাহেবের এই কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। তিনি নানা ভাবে কথা ঢাকিতে চাহিলেও আসল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এতজন মুসলমান কবি হিন্দুয়ানী আদর্শে বিভোর হইয়া মনের পিপাসা মিটাইলেন, ইহা বড় অনুতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কোন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি হিন্দু সমাজ তাহার প্রশংসা করিবেন? মোহাম্মদী পত্রিকায় কয়েক সপ্তাহ দুই একজন হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায় সমগ্র হিন্দু সমাজ ও সংবাদ পত্র মহলে মহা একটা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। মুসলমান সমাজ যে দিন দিন ধ্বংসের মুখে যাইতেছে তাহা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

এই অনৈসলামিক ভাব আমাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রেমসিন্ধু বা ছহিফা সঙ্গীত নামক এক খানা গানের পুস্তকে একজন পরলোক-গতা মোসলেম মহিলা (আল্লাহ তাহার মগফিরত করুন) প্রথমেই সরস্বতী দেবীর বন্দনা করিয়াছেন:—

আসর—তাল—লুভা।

এ আসরে আইস হরি ডাকি বিনয় করি।
আসরে আসিলে রূপ হেরব নয়ন ভরি।

হরি ডাকি বিনয় করি।
দেখ সরস্বতী সভাপতি আসরে প্রহরী।
নমস্কার করিতেছি ঐ শ্রীচরণে ধরি।
চন্দন ফুটা পুষ্পমালা দিব আদর করি।
শ্রবন করিব কর্ণে শ্যাম চান্দের মুরারী।
চতুর্দ্দিকে সখা সখি মধ্যে শ্যাম কিশরী॥
আনন্দে গাইতেছে গুণ জয় রাধা শ্রীহরি।
হীন ছহিফা বলে আমি বিদ্যাহীন নারী।
কেমনে যাইব কুঞ্জে দ্বারে বসা আছে দ্বারী॥

গাজী কালু ও চাম্পাবতীর সাযের মুন্সী আবদুর রহিম তাহার পুথিতে মুসলমান দরবেশ গাজী কালুর সহিত চণ্ডি গঙ্গার যে সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন, ইহা অতিশয় হাস্যাস্পদ সন্দেহ নাই। তিনি ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন—

"হেন কালে শিব জায়া রথ নামাইয়া।
গেলেন গাজির কাছে হাসিয়া হাসিয়া॥
চণ্ডিকে দেখিয়া গাজি ছালাম করিল
আশীর্ব্বাদ করি চণ্ডি কহিতে লাগিল॥

৮৯ পৃষ্ঠা—

"মাসি বলি গাজি তিন ডাক দিল।
মকর বাহনে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল।
উঠিয়া জিজ্ঞাসে—কহ ভগ্নির নন্দন।
কি কারণে মোরে বাছা করিলে স্মরণ॥

মোসলেম জগতে যে এত বড় বড় অলি দরবেশ ও সাধক গুজরিয়া গিয়াছেন, তাহারাত রাধা কৃষ্ণের প্রেমে বিভোর বা সরস্বতীর বন্দনা করেন

নাই। মৌলানা রুমি, জামি, হাফিজ, সাদি প্রভৃতি সাধক কবি ত রাধা কৃষ্ণের প্রেমে না মজিয়াও পিপাসা মিটাইয়া গিয়াছেন। তাহারা মনকে কৃষ্ণ ও রাধাকে দেহ কল্পনা না করিয়াও জগতে ভগবত প্রেমের এক উজ্জল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বরং নানক, কবির, রাজা রাম মোহন রায় প্রভৃতি হিন্দু সমাজের বড় বড় সাধক ও সমাজ সংস্কারকগণ ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একেশ্বর বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় যে ইসলাম ও কোরাণ হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় ১৩২৯ বাং বৈশাখ মাসের "বঙ্গ বাণীতে বলেন—"তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেরণা আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মতাজোলা সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মাত্র বলিলেও হয়। পাটনায় পারসী ও আরবী পড়িতে যাইয়া মুসলমান সাধনার সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেববাদ ও প্রতিমা পূজার বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয়।"

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপধ্যায় মহাশয় বলেন—"তিনি তথায় (পাটনায়) দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও আরিষ্টাটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই উভয় গ্রন্থ পাঠে তাহার স্বভাবতঃ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শক্তি বিশেষরূপে সুমার্জ্জিত হয় এবং যে শক্তি উপধর্ম্ম নিচয়ের ভিত্তিমূল বিকম্পিত করিয়াছিল তাহা প্রথমে এইরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ হয় যে আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্য মোসলমান মৌলবীদিগের সংস্রবে আসাতে তাহার মনে এই সময়েই একের ভাব ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুফীদিগের গ্রন্থ পাঠে তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন। এই আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। পরিণত বয়সে তাহার প্রিয় হাফেজ, মৌলানা রুমি, তাব্রিজ প্রভৃতি ছুফীগণের গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি কবিতা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।"

সাধক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিতের ৫৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ইন্দু প্রকাশ বন্দোপধ্যায় মহাশয় বলেন—"ফির্দৌসি, সাদি, ওমরখৈয়াম, জামি, জালাল উদ্দিন রুমি প্রভৃতি পারস্যের বাণি পুত্রগণও তাহার সখা ছিলেন। কৃষ্ণ চন্দ্র বাহ্যিক আচারে হিন্দু হইলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি ভক্ত সুফী হইয়া উঠিয়াছিলেন।" কিন্তু আজ আমরা বাঙ্গালী মুসলমানগণ বাহ্যিক আচারে মুসলমান হইলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছি।

কেবল প্রাচীন সাহিত্য নহে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যও আলোচনা করিলে দেখা যায় এই অনৈসলামিক ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ডাক্তার সৈয়দ আবুল হুছেন এম, ডি, সাহেব তাহার যমজ-ভগিনী কাব্যের প্রথমেই পুজিগো মা সরস্বতী············বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। ১৯০৬ খৃঃ ৬ই আগষ্টের "স্বদেশ" পত্রিকা এই তোফা সরস্বতী বন্দনা বেশ এক তরফা ডিক্রি দিয়াছেন। স্বদেশ বলেন—"পূজিগো মা সরস্বতী·········ইত্যাদি। ইহাতেই তাহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়"। একেশ্বরবাদ প্রচারক হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) বংশধরের উপযুক্ত কার্য্যই বটে।

আমাদের দ্বিতীয় মাইকেবল কায়কোবাদ সাহেব তাঁহার মহাশ্মশান কাব্যের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন—

"পতিত পাবনী গঙ্গে
নেচে খেলে হেসে দুলে কুলু কুলু তান তুলে
কোথা যাও মন রঙ্গে গঙ্গে।
কলনাদিনী তারিণী পতিত-পাবনী গঙ্গে
কোথা যাও মন রঙ্গে গঙ্গে।"

৭০৬ পৃষ্ঠা—

জয় রণ রঙ্গিনী
বিঘ্ন বিনাশিনী
কালী করালিনী শ্যামা।

হরহৃদি মোহিনী
ত্রিভুবন তারিণী
নৃমুণ্ড মালিনী বামা।"

নবযুগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব তাহার ডালি নামক কবিতা-পুস্তকের ভ্রম-সংশোধনে বলেন—

গ্রামের পথে চলিয়াছি
বিদেশী পথিক আমি,
অদূরে মন্দিরে উঠিছে বাজি
শঙ্খ ঘণ্টা কাসর রাজি
দিগ দিগন্ত আধার করি
আসিছে সন্ধ্যা নামি।

সৈয়দ সাহেব সন্ধ্যার সময় মগরেবের আজান শুনিতে পাইলেন না, তৎ-পরিবর্ত্তে তিনি শুনিতে পাইলেন শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর রাজির বাজনা।

১৩২৬ বাং ভাদ্র মাসের "সওগাত" পত্রিকায় স্বামীহারা গল্পে হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম সাহেব বলেন—

"ওগো দেবতা! তুমি অনেকের হতে পার, কিন্তু আমার যে আর কেউ নাই।"

সাধনার জয়ে অধ্যাপক জানে আলম সাহেব তাহার নায়ক নায়িকার মুখ দিয়া আল্লার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর ফেকার বদলে শাস্ত্র ও ফজর নমাজের পরিবর্ত্তে প্রভাত বন্দনা (পৃঃ ৭) ব্যবহার করিয়াছেন।

পৃঃ ১৪ গৃহিনী—"দেখুন ঈশ্বরেচ্ছায় যা আছে, তাতে "সমা" আমার পায়ের উপর পা রাখিয়া খাইয়া যাইতে পারিবে।"

পৃঃ ২৯—ইয়াকুতি উত্তেজিত হইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিল—"জগদীশ্বর তোমার মহিমা। ......যাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্বর্গের দেব বালার পূজ্য, সেই মহাপুরুষের হৃদয়ে এ কীটানুকীট বিরাজিতা।"

উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কোন মোসলেম মহিলার মুখে জগদীশ্বর, ঈশ্বরেচ্ছায়, শ্রীপাদপদ্ম বলা শোভা পায় না। মুসলমানের মুখে আল্লা, নমাজ, রোজা বলাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ইয়াকুতি যে তাহার ভাবী স্বামীর সম্মুখে নাটকের অভীনেতৃর মত বেহায়ার ন্যায় বড় বড় সংস্কৃতওয়ালা বাক্য আওড়াইবে ইহা নিতান্ত অন্যায়। যদি কোন অঞ্চলে বাস্তবিক এইরূপ অনৈসলামিক ভাব প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে আঞ্জুমন ওলামার একজন প্রচারক তথায় পাঠান নেহাত দরকার।

বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য সাধারণ সাহিত্য অনৈসলামিক ভাবে লিখিত পাঁচ বৎসরের কোমল হৃদয় মুসলমান ছাত্র ক, খ, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠ করে, "গোপাল অতি সুবোধ ছেলে। সে পিতা মাতার কথা শুনে। কাহারও সহিত কখনও ঝগড়া বিবাদ করে না। ইত্যাদি"

আবদুল্লা অতি ভাল ছেলে সে যে প্রত্যহ পাঁচ অক্ত নমাজ পড়ে, ফজরের নমাজের পরে কোরাণ তেলাওত করে ও পিতা মাতার কথা শুনে, সে কথা মুসলমান বালক জানিবার সুযোগ পায় না। সে অতি শৈশবকাল হইতেই পুস্তকে লিখিত গোপাল ও শ্রেণীর অন্যান্য হিন্দু ছাত্রের ও তাহার শিক্ষক হরিবাবুর আদর্শে জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করে। প্রস্তরে খোদিত রেখার ন্যায় শৈশব কালের সে ছাপ পরীণত জীবনেও সহজে মুছিয়া যায় না। এজন্যই আমরা অনেক খ্যাতনামা পরিণত বয়স্ক মুসলমান লেখকের কাব্য ও উপন্যাসে অনৈসলামিক ভাবের ছাপ দেখিতে পাই।

"যে মহাবিষ প্রত্যেক বঙ্গীয় মোছলমান যুবকের হৃদয়ে শৈশব হইতে সারা শিক্ষাকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে, দিন দিন তাহার জাতীয়তা সমাজ,

অনুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতেছে, তাহা বর্ত্তমান পাঠ্য নির্ব্বাচন প্রণালী। সাত বৎসরের মোছলমান বালক রাম, সীতা, ভীমার্জ্জুনের ইতিহাস অনর্গল বলিতে পারিবে, কিন্তু একজন বিংশ বর্ষীয় যুবা তাহার নিজের পয়গম্বর ও তদানীন্তন মোছলমান মহাপুরুষদিগের সমন্ধে কোন কথা বলিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা শিক্ষা প্রণালীর আর কি দোষ হইতে পারে?

"সুকুমার শৈশব হইতে বরাবর ঐ রাম, ঐ সীতা, ঐ কৃষ্ণ, নাম শুনিতে শুনিতে মোছলমান ছাত্র পরম বৈষ্ণব হইয়া যাইতেছে, অথচ একখানি সাহিত্যের সহিত তাহার সাক্ষাত হয় না, যাহাতে তাহার আত্মপরিচয় সে লাভ করিতে পারিবে, যাহাতে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিমালা তাহাকে সঞ্জীবীত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। যে অতীত বর্ত্তমানকে গঠন করে, যে অতীতের গঠনা ভবিষ্যতকে আকার দান করে, সে অতীত গৌরব গাথা প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে বালক বালিকার হৃদয় বৃত্তি সমূহের বিকাশের জন্য মহামন্ত্র রূপে চিরকাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় মোছলমান সমাজে বালক বালিকার পক্ষে সে আলোক দ্বার রুদ্ধ।"

(ছাত্র সমাজে জাতীয়তা—এম্ আনছারী)
আল এসলাম—মাঘ—১৩২৪ বাং

তারপর উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি সীতার পতি ভক্তি, কর্ণের দানশীলতা, ভিস্মের স্থির প্রতিজ্ঞা, ভরতের স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে ও শুনিতে শুনিতে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পক্ষান্তরে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অভাবে মুসলমান ছাত্র হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনের মহান আদর্শ, বিবি রহিমার পতি ভক্তি, হজরত উসমানের দানশীলতা, খলিফা হারুণ রশিদের ও সুলতান মাহমুদের বিদ্যুৎসাহিতা, হজরত ওমরের ন্যায়পরায়ণতা, হজরত আবদুল কাদির জিলানীর ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি জানিবার সুযোগ পায় না। পরন্তু মুসলমান ধর্ম্মের অসারতা,

মুসলমান সমাজের জাতীয় হীনতা, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একহাতে কোরাণ আর অন্য হাতে তরবারি লইয়া ইসলাম প্রচার, পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান বাদশাহগণ নেহাত জালীম ছিলেন, ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে মুসলমান বালক শৈশব হইতেই জাতীয় বিদ্বেষী হইয়া উঠে এবং নিজ ধর্ম্ম ও সমাজকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করে।

এই স্কুল পাঠ্য পুস্তকের দুই একটা দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

D. N. Mozumdar এর A short history of India নামক স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"Kabir's aim was to unite the Hindus and Mohammedans alike." "God "he declared" is one whether called Ali by the Moslem or Rama by the Hindus."

ইহা পড়িয়া বাস্তবিকই বলিতে ইচ্ছা হয়, "বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র যাহা পড়িতে পায়, তাহা স্বুবর্ণ পিয়ালায় সঞ্চিত মহাবিষ। উহা রাত্রিকে দিন বলিয়া ভ্রম জন্মায়, স্বর্গকে নরক বলিয়া পরিচয় দেয়।" একজন স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস লেখক মুসলমান ইতিহাস ও ধর্ম্মে একটু জ্ঞান না লইয়া এরূপ অদ্ভুত কথা কি প্রকারে লিখিলেন তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। হজরত আলী ছিলেন, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) এক জন শিষ্য ও তাহার চতুর্থ খলিফা এবং রাম ছিলেন অযোধ্যার দশরথ রাজার পুত্র। রাম বা আলী কেহই মুসলমানের আল্লা নহেন। তৌবা, তৌবা, একথা মুসলমান ছাত্র কি প্রকারে বলিবে ?

যে মুসলমান ছাত্র তাহার প্রিয় পয়গম্বরের নিন্দা পর্য্যন্ত শুনিতে সহ্য করিতে পারে না, তথা কথিত the adjustment of learning ছাপ মারা কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুগ্রহে, তাহার প্রিয় নবীর চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ ও তীব্র কটাক্ষপাত তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়িতে হয়। ইহা হইতে অন্যায় ও অবিচার আর কি হইতে পারে।

Elphinstone's "History of India" কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া বি, এ, শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকের লিষ্টে অনেক বৎসর হইতে বিরাজ করিতেছে। এই পুস্তক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি কমিশনে ও সাময়িক পত্রিকায় মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে ইহার কঠোর সমালোচনা হইলেও, সমগ্র মুসলমান সমাজের মত অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয় কোন সাহসে এখন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত পাঠ্য তালিকায় এই পুস্তক-খানা রাখিলেন, তাহা বলা যায় না। এই ইতিহাসের ২৯৪ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে, তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি Elphinstone's History of India—পৃষ্ঠা—২৯৪—৫

"At the commencement of Mohamet's preaching, he seems to have been perfectly sincere, and although he was provoked by opposition to support his pretension by fraud and in time became habituated to hypocricy and in posture, yet it is probable that to the last, his original fanaticism continued in part at least to influence his actions. But whatever may have been the reality of his zeal and even the merit of doctrine, the spirit of intolerance in which it was preached and the bigotry and the bloodshed in which it was ingendered and perpetuated must place its author among the worst enemies of mankind.

এ সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটি কমিশন কি বলেন, দেখুন :—

1917-19 Calcutta University Commission Report Vol I. Chap VI. Page 175.

66. The majority of our Mussalman witnesses do not hesitate to attribute to their lack of Mussalman representation in the University and on governing bodies of several colleges, not only the unadequate portion of the Mussalmans among students of the University, but also this continuence of the

conditions which are alleged by Mussalmans to be prejudical to the interests of the Mussalman students. Most of these grievances are referred to in the course of this chapter. We summarise them below.

(d) The encouragement by the University of a Sanskritised Bengali, which is difficult for the Mussalmans to acquire.

(e) The use by the University of books which are either uncongenial to Mussalmans as being steeped in Hindu religious traditions or even positively objectionable to them, because they contain statements offensive to Muasalman sentiments. Elphinstone's History of India is cited as a case in point."

কিন্তু এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটির টনক নড়িল না।

"শ্রীহট্ট মুসলমান ছাত্র সম্মিলনীর" সভাপতির অভিভাষণে স্কুল সমূহের অবসর প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল করিম বাস্তবিকই বলিয়াছিলেন—

"What of suitable text-books for the use of Mussalman boys attending Pathshalas and schools and even Maktabs and Madrassas has been a crying complaint for a long time. Books written by non-muslim writers are naturally full of their national ideas and sentiments, illustrations from their own history and mythology and quotations from their own scriptures and classics. Those boys who do not get at home a sufficient grounding in their own literature and religion are naturally affected by the study of such books. Thus Mussalman boys instead of inspired by Islamic ideas and ideals, sub-conciously imbibe non-muslim thoughts and ideas and show non-muslim tendencies in their manners and behaviour."

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের প্রথম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় সমসুলওলামা মৌলানা আবু নছর অহিদ এম, এ, সাহেব বলেন—

65. It is a sort of Sanskritised Bengali permeated with Sanskrit words, saturated with Sanskritic ideas and interwoven with Sanskritic structure and Hindu myths, almost out of recognition and with all rigidity and stiffness of a dead language.

এই বিজাতীয় সাহিত্যের প্রভাবে মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে যে বিষ বীজ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে, সে সম্বন্ধে এই কমিশনের ২৭৪ পৃষ্ঠায় মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব বলেন—

66. "He (Moulvi Abdul Aziz lecturer in Arabic and Persian at Dacca College) states that the Vernacular system by compelling all Muslim boys to learn Bengali mostly under Hindu teachers, has so greatly changed their ideas, not to speak of their manners and customs, that an official note from an Asst. Inspector of schools of the Dacca Division to the special Asst. Director of Public Instruction in Bengal stated that he found fifty per cent of the Muslim boys in secondary schools believing in the transmigration of the soul."

স্কুলের শতকরা পঞ্চাশ জন মুসলমান ছাত্র ইসলাম ধর্ম্মে আস্থাহীন জন্মান্তর-বাদী হইয়া পড়িয়াছে ইহা হইতে মারাত্মক সংবাদ আর কি হইতে পারে ?

১৩২৫ বাং ৭ই চৈত্রের মোহাম্মদী বাস্তবিকই বলেন, "স্কুল কলেজের মুসলমান যুবকগণের মধ্যে প্রতিবেশী হিন্দু জাতীর অনুকরণ প্রিয়তা ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। ধুতী পরাত আছেই, কিন্তু যে ধুতি পরিলে ছতর ঢাকে না, যাহা লইয়া নমাজ পড়া চলে না, যাহা অতি অল্প সময়েই নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ব্যবহার জন্য মুসলমান ছাত্র ব্যস্ত তৎপর নগ্ন মস্তকে থাকা, মুরব্বী

জনের সম্মুখে টেরী কাটিয়া, চুলগুলাকে ১৮ প্রকারে আঁকা বাকা করিয়া রমণী সুলভ সাজ সজ্জার পরিচয় দেওয়া, এখন আধুনিক সভ্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে চলিয়াছে। মস্তকাভরণ যে সভ্যতার একটা নিদর্শন এবং জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির যে মস্তকাভরণ বা টুপী একটা নিত্য প্রয়োজনীয় পোষাক বাঙ্গালার মুসলমান যুবকগণ তাহা ভুলিয়া গিয়া ঘোর অসভ্য সাজিতে লালায়িত।"

কেবল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া ও হিন্দু জাতির অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলার মুসলমান যুবকগণ ক্ষান্ত হয় নাই। ইহার চেয়ে আরও ভীষণতর সংবাদ শ্রবণ করুন। ১৩২৬ বাং কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীর ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"আবার সাধু হরিদাস—পিরোজপুরের সন্নিহিত কুমার খালি নিবাসী কাজল খা নামক জনৈক মুসলমান পূর্ব্বে পুলিশ কনষ্টেবল ছিল। সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, হাতে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে শিখা, ও হস্তে লোহার চিমটা। তাহাকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া বুঝা যায় না।

রহমতপুরের আছমত আলী নামক একটি মুসলমান যুবকের কথা শুনিলাম সে প্রায় ১ বৎসর যাবৎ হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছে সে প্রায়ই হরিনাম নিয়া নৃত্য করিতে থাকে। "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, গৌর নিতাই রাধে শ্যাম," এই বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং এই নামে বিভোর হইয়া পড়ে। আছমত আলী মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে; এক সন্ধ্যা আতপ অন্ন নিজে নূতন হাড়িতে পাক করিয়া খাইতেছে।"

(কাশীপুর নিবাসী)

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে অনৈসলামিক ও বিজাতীয় বিকৃত আদর্শ কি ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। এবং মুসলমান বালক বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ভাবাপন্ন

হইয়া, ক্রমে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস স্থাপন, পরে স্বীয় সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং শেষে বাস্তবিক প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু হইয়া পড়ে। দুই একজন মুসলমান কোন বিশেষ কারণে হিন্দু হইয়া গেলে, সমাজের বড় একটা আসে যায় না। কিন্তু আজ যে সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। ইহার কোন উপায় নিবারণের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ জাতীয় সাহিত্য গঠন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে পূরা দস্তর ইসলামী ভাষা ও আদর্শ বজায় রাখিতে হইবে। সে সাহিত্যে পৌত্তলিকতার ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিবে না। ইতিহাস, কাব্য, ও উপন্যাসে সম্পূর্ণ ইসলামী তেজে অনুপ্রাণিত থাকিবে। হজরতের জীবনী, খোলাফায়ে রাশেদিনের ইতিবৃত্ত, মুসলমান বাদশাহগণের কীর্ত্তি কলাপ, অলী কুতুব দরবেশ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের ঐকান্তিক সাধনার বিষয় লিখিয়া মাতৃ ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। আরও অধিক পরিমাণে দৈনিক, সপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে হইবে। আরবী, ফারসী, ও উর্দ্দু সাহিত্য হইতে উপাদেয় গ্রন্থগুলি আমাদের মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। "আরবী আমাদের জাতীয় ভাষা ও জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। জ্ঞানের সেবা, বিবেকের যুক্তি, মানবের অধিকার, সমাজের আদর্শ, রাষ্ট্রের শাসন ও উদার অর্থনীতি প্রভৃতির যে মহান আদর্শ আরবী সাহিত্যে আছে, তাহা নিজ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া জগত সম্মুখে প্রকাশ করিতে হইবে। নিজে খাজানায় প্রবেশ করিয়া বহু শতাব্দি সঞ্চিত উপরের ধূলাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভূগোল—খগোল, দর্শন-বিজ্ঞান, চরিত-ইতিহাস, চিকিৎসা ও রসায়ন যাহা কিছু লইয়া আজ সভ্য জগতে গর্ব্ব করিতেছে, তাহা আমাদের দেশবাসীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে হইবে।"

(আকরম খাঁন)।

এই যে বৎসর বৎসর বাঙ্গলা দেশে কত মুসলমান অন্তরে অন্তরে হিন্দু ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং প্রকাশ্যভাবে বিধর্ম্মী হইয়া যাইতেছে, এজন্য কি আমাদের আলেম-সমাজ দায়ী নহেন? তাহাদের কি সমাজের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই?

"মাতৃভাষার সেবা করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও আমাদের আলেমগণ ধর্ম্মের হিসাবে মাতৃভাষার সেবা করিতে বাধ্য। এছরাইল বংশের মধ্যে যুগে যুগে এবং দেশে দেশে নূতন নবী ও নূতন কেতাব আসিয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে এসলাম সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল যুগের এবং আমাদের হজরত শেষ নবী। তাহার পর আর কোন নবী বা পয়গম্বর আসিবেন না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এসলামের সত্যগুলিকে জগতের সকল দেশে, সকল যুগে, সকল জাতির মধ্যে প্রচার করিবেন কাহারা? ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে,—"ওলামা ও উম্মতিকা আম্বিয়ায়ে এছরাইল" অর্থাৎ এই শেষ নবীর উম্মতের আলেমগণই পূর্ব্বযুগের নবীগণের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালার আলেমগণই বঙ্গদেশের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দায়ী। ভাষা সমস্যার সমাধান স্বয়ং কোরাণই করিয়া দিতেছেন। "অ-মা আরছালনা মিররাছুলেন ইল্লা বে লেছানে কওমেহি লে য়ুবায়্যোনা লাহুম।" ইহার ভাবার্থ এই যে প্রচারক ও উপদেষ্টা নিজের জাতিকে মাতৃভাষার দ্বারাই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, নচেৎ তিনি অন্যের ভাষা অবলম্বন করিলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এজন্য আল্লা-তালা প্রত্যেক জাতির নিকট তাহাদের মাতৃভাষাভাষী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আলেম মহোদয়গণ এখনও কোরাণের নির্দ্ধারিত চিরাচরিত ঐশিক বিধানের প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেছেন। বঙ্গীয় আলেম সমাজের প্রভাব যে শিক্ষিত সমাজ হইতে কমিয়া যাইতেছে, সাধারণ ভাবে তাহাদের সাধনা যে সিদ্ধি লাভ করিতে

পারিতেছনা, মাতৃভাষার অনভিজ্ঞতা একটা প্রধান কারণ: পুর্ব্বে আলেমগণ কেবল মাতৃভাষার পারদর্শিতা লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; হিব্রু, গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি সমস্ত ভাষা আরস্ত করিয়া তাহাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সম্পূর্ণ রূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। আর আমরা নিজের মাতৃভাষাটাও শিখিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আর কি হইতে পারে?

(আকরম খান)

অতএব আসুন, হে আমাদের মাথার মণি হাদীয়ে দীন, নায়েবে রছুল আলেম সমাজ বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় মন দিয়া নিজ জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে অগ্রসর হউন।

সংস্কৃত বনাম বাঙ্গলা ভাষা।

সংস্কৃত বহুল বাঙ্গলা আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি পথের এক প্রধান অন্তরায়। সিন্ধুবাদের দ্বীপবাসী বৃদ্ধের ন্যায় সংস্কৃত এতদিন বাঙ্গলা সাহিত্যের গলা চাপিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। এই সংস্কৃত ভূতকে ঝাড়িয়া আরোগ্য না করিলে, বাঙ্গলা সাহিত্য সুস্থ ও সবল দেহে চলাফিরা করিতে পারিবে না এবং দুনিয়ার উন্নতির তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিবে না।

আমাদের মুসলমান লেখকগণের রচনা পাঠ করিলে বুঝা যায় আমরা এখনও সেই বিদ্যাসাগরের আমলে পড়িয়া আছি। আমাদের মুসলমান আল-এসলাম অর্দ্ধ শিক্ষিত অপণ্ডিত মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দ্যেশ্যে প্রচারিত হইলেও ইহা হিন্দু "ভারতবর্ষ" "নারায়ণ" "প্রবাসী" প্রভৃতির চেয়েও অধিক সংস্কৃত ঘেষা। ইহার কোন কোন শব্দের অর্থ বোধের জন্য অভিধান খুলিতে হয়। ত্রিবেদী মহাশয় বাস্তবিকই বলেন—"ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোক শিক্ষা, তখন সে ভাষায় লোক শিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তাহাই সার্থক ভাষা। যে ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিবে, আর মূর্খে বুঝিবে না, সে ভাষার অস্তিত্ব অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক।"

আমাদের লেখকগণ মনে গড়া না বলিয়া "স্বকপোল কল্পিত" ভ্যাবাচেকা না বলিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় বলেন। কি জানি কেহ মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া বিদ্রুপ করে। বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘেরই ভয় বেশী। সাহিত্য বিশারদ সাহেবের—"সান্ধ্য অংশুমালীর অংশুজালে স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট," "শৈল কিরীটিনী সাগরম্বরা জন্মভূমি"; "কোকিল কুলের সুধা নিষ্যন্দিনী কাকলী" প্রভৃতি এবং আল এসলামে প্রকাশিত সিরাজী সাহেবের "তুঙ্গ তরঙ্গিত তোয়নিধির ভীমোম্মদ দৃশ্য"; "তাল-তমাল-তরু-মালিনীর অটবীর স্নিগ্ধ ও

ফুল্ল শোভা" ; "তরুণ-তপন-রাগ-রঞ্জিত-মণ্ডিত-হিমগিরির-তপ্ত-কাঞ্চনচ্ছটা বিকিরিণী-বিস্ময়-জননী শোভা" ; প্রভৃতি সমাস বহুল বাঙ্গলার দিন অতীত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"আমরা বাঙ্গলায় নূতন কথা প্রস্তুত করিতে পারিলেও সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়া থাকি। হেট মাথা, হাটু লম্বা, এইরূপ সরল ও চমৎকার বাঙ্গলা পদ থাকিতেও লোকে ঐ সকল ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন ; আর সে গুলির বদলে "অবনতমস্তক" "আজানুলম্বিত" পদগুলি লিখিয়া থাকেন। কেন আমরা কি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গলা কথা লিখিতে লজ্জা বোধ করি? মার অপেক্ষা গুরুজন এ সংসারে কেহই নাই। আমরা বড় হইয়া যে সকল কথা তাঁর কাছে ব্যবহার করি, সে কথা লিখিতে কুণ্ঠিত হই? ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষায় ভাইকে "ভাই" বলে ও লেখে ; কিন্তু আমরা ভাই বলি, কিন্তু লিখিবার সময় আমাদের প্রমাদ ঘটে, আমরা ভ্রাতা লিখি। "চাঁপা" ছাড়িয়া আমরা চম্পক ভক্ত হইয়াছি, চাঁদ ছাড়িয়া চন্দ্র শব্দ খুড়িয়া বাহির করিয়াছি, যদিও চম্পক ও চন্দ্র হতে চাঁপা ও চাঁদ অনেক মিষ্ট।

(পাগলের কথা—৺দেবেন্দ্র নাথ দাস)

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য অনেকটা সহজ ও সরল ছিল। চণ্ডিদাস, ভারত চন্দ্র প্রভৃতির কাব্য পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও কবিগানে বাঙ্গলা ভাষা সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বাঙ্গলা সাহিত্য প্রকৃত বাঙ্গালীর ভাষা ছিল। কিন্তু ঘটনা চক্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের "ফরমাইস" যখন সংস্কৃত পণ্ডিতের হাতে পড়িল, তখন তাঁহারা সংস্কৃতের গারদে পূরিয়া পিটিয়া পাটিয়া ইহাকে এমন ভাবে দোরুস্ত করিলেন, যে, তখনকার বাঙ্গলা সাহিত্য সাধু হইল বটে, কিন্তু উহাতে আর প্রাণ রহিল না। উহা একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

" ফোর্ট উলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জিত সাধু বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাঙ্গালা

রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা সাধু ভাষা হইল বটে; ও সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানতঃ উহা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিল।

(ত্রিবেদী)

"বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধর হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত; বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ। তারা এ ভাষার কখনও মুখ দর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন, যাহার কেবল বিধিই আছে, গতি নাই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্ত্তার ফরমাসে তারা সোণার সীতা গড়িলেন।

গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা; কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

(রবিন্দ্র নাথ—সবুজ পত্র ১৩২৪ বাং)

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণের পরিশিষ্টে বলেন —" বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিগণন অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। সাধু বাঙ্গালা শব্দের দুই একটি বাক্য দেখিলেই বুঝা যাইবে, সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিলে এ ভাষার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, যথা :—

" রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

(৺ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর)

"বনতলস্থ কোমলকায় গুল্ম সমূহ শৈত্য-সৌগন্ধ-মান্দ্যময়-পবন-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উহাদিগের শরীরে চামর ব্যজন করিতেছে"

(শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

উপরের চিহ্নিত শব্দগুলি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিজের দেওয়া। এখন আমরা দেখিতে পাই উপরোক্ত প্রথম বাক্যে মোট আটটী শব্দ ও দ্বিতীয় বাক্যে মোট এগারটি শব্দ। তন্মধ্যে প্রথম বাক্যে আটটীর আটটীই সংস্কৃত ও দ্বিতীয় বাক্যে এগারটি শব্দের মধ্যে দশটি সংস্কৃত মাত্র একটি বাঙ্গলা। বিদ্যারত্ন মহাশয় দুইজন গ্রন্থকারের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া সাধু বাঙ্গলা বনাম পণ্ডিতী বাঙ্গলার যে ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, অসংস্কৃত আমরা উহাকে ত খাটি বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। ইহা প্রকৃত বাঙ্গলা নয়, বাঙ্গলার ছদ্মবেশে সংস্কৃত। "এ একরকম ঠকানো বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে খাদ মিশান করা হইয়াছে।"

আরও অদ্ভুত ধরণের বাঙ্গলার নমুনা দেখুন। ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধ চন্দ্রিকায় আছে "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কনাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। ইহা সংস্কৃত কি বাঙ্গলা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহার সহিত কয়েকটি অনুস্বার বিসর্গ যোগ করিয়া দিলে খাসা সংস্কৃত হইয়া যাইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম সংস্করণের বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে— "উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল-উৎফুল্ল-ফেন-নিচয়-চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ স্রোতস্বতী পতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভুত হইল।"

এখন বাঙ্গলা সাহিত্যে সংস্কৃত পণ্ডিতের সেই অপ্রতিহত প্রভাব আর নাই। "তারা শঙ্করের রেসালস্ ও কাদম্বরীর ভাষার দিন গিয়াছে, অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ ও উপাসনা সম্প্রদায়ের দিন গিয়াছে; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার

বনবাসের দিন গিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তাহাদের যুগ হইতে অর্দ্ধ শতাব্দি অতীত হইয়াছে; এখন তাহাদের ভাষা সেকালের ভাষা। সংস্কৃত বহুল ও সমাস বহুল ভাষা এখন একালের অশ্রেদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্রও সত্বর অতীত যুগের মধ্যে গণনীয় হইবেন। সে ভাষাকেও সমুদ্র গর্ত্তে নিহিত করার জন্য তরঙ্গ উঠিয়াছে।

(৺ সারদা চরণ মিত্র—ভারতবর্ষ ১৩২৩বাং)

পূর্ব্বে অনেকেই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের ভয়ে তাহাদের কড়া শাসন অমান্য করিবার বদ সাহস করিতেন না। বহু পূর্ব্বে 'আলালের ঘরের দুলাল' বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইলেও তাহাদের ক্রোধ উৎপাদনের ভয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজ তাহার সহিত যোগ দান করেন নাই। মাইকেল মধুসুধনকে সেজন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া এক ঘরে হইয়া কাটাইতে হইয়াছিল। বঙ্কিম চন্দ্রকে অনেক কটু কথা শুনিতে হইয়াছিল। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্র নাথেরও "যে বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন পুথির ভাষাতেই পুথি লেখা চাই, একথায় সন্দেহ বা সাহস ছিল না।"

(সবুজ পত্র—১৩২৪ বাং)

প্রাচীন পণ্ডিতী বাঙ্গলা ও নবীন অপণ্ডিত বাংলার লড়াইএ সংস্কৃতের প্রভাব ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। ইহা দেশের ও সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলপ্রদ। বাঙ্গলা সাহিত্য সংস্কৃতের বহু দিনের এই নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া দেশ বিদেশে আপনার দূত প্রেরণ করিয়া বিশ্বের দরবারে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে।

বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা।

—::—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে চড়িয়া অনেকগুলি নূতন বিদেশী শব্দ আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তারপর ইংরেজী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সহিত সে শব্দগুলিও আমাদের ভাষা ও সমাজে পাকা বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। "টেবিল, চেয়ার, বাক্স, তোরঙ্গ, বোতল, বিস্কুট প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত কোর্ট, আপীল, পুলিশ প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানী পদার্থের মত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে।"

(ত্রিবেদী)

আমরা এখন School কে ইস্কুল, Table কে টেবিল, doctor কে ডাক্তার Office কে আফিস, Captainকে কাপ্তান, Bottleকে বোতল, Treasury কে তেরজুড়ি, করিয়া এক দম হজম করিয়া ফেলিয়াছি। সে গুলিকে উঠাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন। দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহা মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে সাহিত্যেও স্থান দিতে হইবে। সাহিত্য ভাষার সাক্ষী মাত্র। ভাষা যে পথে গিয়াছে সাহিত্য সেই পথটি দেখাইয়া দিবে মাত্র। আমরা যদি ইংরেজী স্কুল, কলেজ, ডিগ্রী ডিসমিস প্রভৃতি শব্দকে তাড়াইয়া দেই, আমাদের সাহিত্য শব্দ সম্পদ আরও হীন হইয়া পড়িবে।

কেহ কেহ জাতীয়তার খাতিরে কেবল সংস্কৃত হইতেই নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন—"প্রাচীন সংস্কৃত রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছাপরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূণ্য হইবার নহে।" এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে সাহিত্য একেবারে একঘেয়ে ও তেজহীন হইয়া পড়ে। টেবিল, চেয়ারের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত আর্য্যেরা টেবিল

চেয়ারে বসিয়া লিখিতেন না ; তাহারা মাদুরে বসিয়া তাল পাতায় লিখিতেন। প্রাচীন বৈদিক বা রামায়ণ মহাভারত যুগে অন্য কোন প্রকারের আসন থাকিলেও ঠিক টেবিল চেয়ারের প্রচলন ছিল কি না এ পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই। কোন বৈদিক-প্রত্নতত্ত্ববিদ এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

আজকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে ইউরোপ আমেরিকায় নানাবিধ কল কারখানা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইতেছে। যন্ত্রপাতির নাম একটা সর্ব্ব নাম বিশেষ। সন্তানের নাম করণ যেমন পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার ; কেহ কোন যন্ত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে তাহার জাতীয় ভাষায় সেটার নাম করণ তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারেও এ নিয়ম প্রচলিত। সার জগদীশ বসুর "কুঞ্চনমান" যন্ত্রের নাম সমর্থন করিয়া বোষ্টনের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকা বলিয়াছিলেন—"যে আবিষ্কার করে তাহারই নাম করণের প্রথম অধিকার।" সুতরাং এ সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নাম রাখা আবিষ্কারকের ইচ্ছামত ভাষায়ই রাখা যুক্তি সঙ্গত ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই।

১৩২৬ বাং কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে জনৈক ঘড়িওয়ালা বলেন—"বিদেশ হইতে যত ঘড়ি আসে তাহার অধিকাংশেরই প্ল্যান (mechanical design) সম্বন্ধে ভুল ত্রুটি থাকে। আল্লা চাবি দ্বারা যখন ওয়াচে চাবি বা দম দেওয়া হয়—তখন রেচেট হুইলের দাতে ক্লিক ঠেকিয়া মেইন স্প্রিংএর (main spring) দম রক্ষা করে। রেচেট হুইলে ক্লিকের ক্রিয়া সম্বন্ধেই আমার অদ্যকার বক্তব্য।............এই প্ল্যানে ক্লিকের মাথা রেচেট হুইলের দাতের মাথায় ঠেকিয়া উহা উচ্কাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টায় থাকে।" রেচেট হুইল, ক্লিক প্রভৃতি ইংরেজি শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই। সুতরাং এইগুলি বাঙ্গলায় রাখিতেই হইবে।

এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে অর্থের ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় আসল জিনিষটাকেই চিনিতে পারা যায় না। Foot ball শব্দটি সর্ব্ব সাধারণের নিকট এখন সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যদি ইহার অনুবাদ

"পদ গোলক" করি তবে ইহা কেহ বুঝিবে না ও ব্যবহার করিবে না। "কংগ্রেস" শব্দটি খাস বিলাতী, কিন্তু আজ কংগ্রেস বলিলে সমগ্র ভারত জুড়িয়া যে তাড়িত প্রবাহিত হয় ইহার প্রতিশব্দ "জাতীয় মহা-সভা" দ্বারা কি তাহা সম্পন্ন হয়? মাদ্রাজের লোক মহা-সভা বলিলে কংগ্রেসকে বুঝিবে না। কংগ্রেস ও লীগ এখন নিখিল ভারতীয় জাতীয় শব্দে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে ইহার প্রচলন হইলেও সমগ্র ভারতের রাজনীতির খাতিরে ইহার একান্ত আবশ্যক। আবার অনেক সময় কেহ কেহ ইংরেজী সংবাদ পত্রের নামের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা প্রতিশব্দ বসাইয়া বা সেই ইংরেজি শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া আসল অর্থ বিগড়াইয়া ফেলেন। ১৩২৯ বাং জ্যৈষ্ঠ মাসের "বঙ্গ বাণীতে" শ্রীযুক্ত সীতারাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া নামক ইংরেজি সপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে "তরুণ ভারত" ব্যবহার করিয়াছেন যথাঃ— "এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "তরুণ ভারত পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।" কিন্তু "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "তরুণ ভারত" দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পত্রিকা। একখানা আহমদাবাদ হইতে ইংরেজী ভাষায়, অপর খানা কলিকাতা হইতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয়। সুবিখ্যাত দৈনিক সার্ভেণ্ট ও The Servant পত্রিকার পরিবর্ত্তে কেহ যদি ইহার প্রতিশব্দ "সেবক" লেখেন, তবে ভুল করা হইবে। কারণ সার্ভেণ্ট ও সেবক দুই বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়। এবং একের সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই। তাই মুসলমান সমাজের মুখপত্র দৈনিক "সেবক" যখন প্রকাশিত হয়, তখন কোন কোন গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদককে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল যে দৈনিক সার্ভেণ্টের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহা সার্ভেণ্ট পত্রিকার কোন সংস্করণও নহে। পত্রিকার নাম সর্ব্বনামের (Proper noun) মত ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অর্থের এই গোলমাল মিটাইতে হইলে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা প্রতিশব্দ লিখিলে চলিবে না। বাঙ্গলা ভাষা লিখিবার সময়ও ইংরেজী ইয়ং ইণ্ডিয়া ও সার্ভেণ্ট রাখিতে হইবে। "পূর্ব্বে

আমাদের দেশে মিউজিয়ম ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিবেন চিত্রশালিকা। কথাটা কেহ বুঝিলও না; মিউজিয়মের ভাবও প্রকাশ পাইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এই জায়গায় মিউজিয়ম লইতে দোষ কি?"

(শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী)

গরীব লোক একখানা ধুতি পরিয়াই শীত গ্রীষ্মের কাজ চালায়। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন কার্য্য ও ঋতুর জন্য নানা প্রকার পোষাক পরিয়া থাকে! সম্পদশালী ভাষারও বিবিধ ভাব প্রকাশের জন্য প্রচুর শব্দ থাকে। কিন্তু দরিদ্র ভাষার একই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন কাজ কুলাইয়া থাকে। শুনিয়াছি আফ্রিকার কোন অসভ্য জাতি মাত্র ৩৫টি শব্দদ্বারা আপনার দৈনন্দিন কাজ কুলাইয়া থাকে। তাহারা যদি জাতীয়তার দোহাই দিয়া কোন বিদেশী শব্দ গ্রহণে নারাজ হইয়া নিজ পিতৃ পুরুষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায়, তবে অবশ্য তাহাদের কার্য্য প্রশংসনীয় নহে। ইহা তাদের আহাম্মকী।

আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে Editor ও Secretaryর অনুবাদ করি সম্পাদক দ্বারা। কিন্তু সংবাদ পত্রের Editor ও সভা বা স্কুলের Secretaryর কাজ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। এক সম্পাদক দ্বারা দুই ভাব সুচারু ভাবে প্রকাশিত হয় না। Manager, Proprietor, Superintendent, Principalর অনুবাদ করি অধ্যক্ষ। কিন্তু শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ও মুরারী চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষের মর্য্যাদা ও কাজ এক নহে। অধ্যক্ষ হইতে মেনেজার শুনিতে ভাল লাগে ও উচ্চারণ করিতে কম পরিশ্রম হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গলার জনসাধারণ বা শিক্ষিত সমাজ যখন কথা বার্ত্তায় অধ্যক্ষ বলে না, তখন Managerকে মেনেজার বলিতে দোষ কি?

ইংরেজী nation শব্দ লইয়া মাসিক পত্রিকায় কিছু আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ জাতি না বলিয়া ন্যাশন ব্যবহারের পক্ষপাতী। আমি

তাঁহার মত সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। কারণ—'বাংলা ভাষায় জাতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা বলি স্ত্রীজাতি, পুরুষজাতি, হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, সাওতাল জাতি নাগাজাতি, ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি, ইংরেজ জাতি জার্ম্মাণ জাতি ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে জাতি কথাটি ইংরেজী Sex, religion, body, tribe, caste, nation প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"নেশ্যনের মানে কি? এক দেশে রাজ্যে বা রাষ্ট্রে এক শাসন তন্ত্রের অধীনে ভৌগলিক সান্নিধ্যে সংহত বা জমাট ভাবে যাহারা বাস করে, তাহাদের সমষ্টিকে নেশ্যন বলে।" (প্রবাসী)। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই নেশ্যন ও জাতি শব্দের অর্থ এক নয়। ইংরেজী nation বাঙ্গলায় নেশ্যন রাখা যুক্তি সঙ্গত।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবেশী উর্দ্দু সাহিত্যের উদার আদর্শ গ্রহণে কি আপত্তি থাকিতে পারে? তাহারা Editorকে এডিটর ও Congressকে মহাসভা না বলিয়া কংগ্রেসই বলে। এমন কি উর্দ্দু ভাষায় কংগ্রেস নামে এক খানা উর্দ্দু সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। এক খানা উর্দ্দু পত্রিকা বাহির করিলেই এ বিষয় তাহারা আমাদের চেয়ে যে কত অগ্রসর তাহা বুঝা যাইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন বাঙ্গলা ভাষা স্ত্রীজাতি ও কান্নার ভাষা। তেজের সহিত কোন কথা বলিতে হইলে উর্দ্দু বা ইংরেজীর আশ্রয় লইতে হয়। মধ্য-যুগে বৈষ্ণব কবিগণের রাম রাবণের যুদ্ধের বর্ণনায় সংকীর্ত্তনের করতালের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। নবীন সেন পলাশীর যুদ্ধে কামানের ধ্বনিতে আম্রবন কাপাইলেও যাত্রা গানের অভিনয়ের সুর আসিয়া আমাদের কানে লাগে। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে শুনিয়াছি সুচিকিৎসকেরা সুস্থ শরীরের মাংস কাটিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া আরোগ্য ও সতেজ করিয়া তোলেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষাকেও সতেজ ও সজীব করিতে হইলে বিদেশী ভাষার সতেজ অংশ

গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষাকে সতেজ করিতে হইবে। উর্দ্দুর কুচ কাওয়াজ, ছাউনী, হামলা, বন্দুক, তোপ, বরকান্দাজ সেপাই প্রভৃতি ও ইংরেজী quick march forward, fire প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া আমাদের ভাষা সতেজ করিতে হইবে। আজ বিশ্বের দরবারে হাজিরার ডাক পড়িয়াছে। বাহিরের জগতের সহিত ভাবের লেন দেন করার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাষার দারিদ্র্যই ইহার প্রধান অন্তরায়। আমরা যদি এই উদার বিংশ শতাব্দিতে বিদেশী শব্দগুলিকে এক ঘরে করিয়া রাখি, তবে আমাদের ভাষাই বিশ্বের নিকট অচল হইয়া থাকিবে।

তেজারত করিতে হইলে দেশ বিদেশের সহিত পণ্য দ্রব্যের আদান প্রদান করিতে হয়। বাঙ্গলা দেশ হইতে ধান ও পাট দিয়া অন্য দেশ হইতে আমরা কাপড় ও চিনি পাই। কেবল রপ্তানী করিয়া বাঙ্গলা কেন আমেরিকার মত সমৃদ্ধিশালী দেশেরও চলিতে পারে না। কোন না কোন জিনিষ বিদেশ হইতে আমাদের লইতেই হইবে। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায়ও এই ভাব ও ভাষার আদান প্রদান করিতে হইবে। আমরা যদি বলি, আমরা কেবল দিব কিন্তু কিছু লইব না, তবে বাঙ্গলা সাহিত্য সজীব থাকিতে পারে না। বিদেশের নিকট এই ঋণ গ্রহণে লজ্জার কোন কারণ নাই। কারণ দুনিয়ার সব ভাষায়ই এই "ঋণ গ্রহণ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই অব্যাহত ভাবে চলিবে; অব্যাহত ভাবে—কেন না ইহাতে সুদও লাগে না, এবং পরিশোধেরও প্রয়োজন নাই; উত্তমর্ণের দ্বারা উন্মুক্ত, অধমর্ণেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।"

(ত্রিবেদী)।

অন্য কোন ভাষার সাহায্য ছাড়া কোন ভাষাই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ইংরেজেরা একদিকে যেমন দেশ বিদেশে বাণিজ্য-জাহাজ পাঠাইয়া, নানা দেশ হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া নিজ জন্মভূমিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জ্ঞান আহরণ করিয়াও নানাবিধ শব্দ রাশি চয়ন

করিয়া নিজ মাতৃ ভাষাকেও জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শক্তিশালী ভাষারূপে গঠন করিয়াছেন। ইংরেজীর মত এত উন্নত ভাষাও ল্যাটিন গ্রীক, ফরাসী, জর্ম্মাণী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা এবং আরবী ফারসী সংস্কৃতের নিকট অনেকটা ঋণী। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিবাদ থাকিলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহারা কোন বিবাদের অবতারণা করেন না। আরবীর আলজাবরা (Algebra) জিওগ্রাফিয়া (Geography), ফিলছফা (Philosophy), আল-কেমি (Chemistry), আমিরুল বহর (Admiral) সুলতান, খলিফা প্রভৃতি এবং আমাদের দেশীয় রাজা, নোয়াব, শাল, এমন কি লাঠি, গোলমাল, জঙ্গল, ডাকাতি, লুঠ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন দেশের ভাব ও শব্দ রাশি চয়ন করিয়া নিজ মাতৃভাষার উন্নতি করিয়াছেন, তাহাদের এই সুগম পথ অনুসরণ করিয়া আমাদের সাহিত্যকেও সেইরূপ উন্নত করিতে হইবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান পণ্ডিত অপণ্ডিত, দেশী বিদেশী সকলের সমান অধিকার। সকলের আসন এক।

"সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পারে। মহৈশ্বর্য্যশালিনী আর্য্য সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্য দেশজ শব্দ অজস্র ভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল ম্লেচ্ছ বৈদেশিকের সহিত আমাদের আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণে এ দেশের আচার্য্যেরা কুণ্ঠিত হন নাই।

"প্রাচীন কালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আদান প্রদান চলিয়াছিল। এই সময়ে সংস্কৃত জ্যোতিষের ভাষায় খাটি গ্রীক শব্দ অনেকগুলি প্রবেশ করে। পাঠকগণের মধ্যে এই সংবাদ যাহাদের নিকট নূতন তাঁহাদের অবগতির ও কৌতুহল তৃপ্তির জন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম।

গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত	গ্রীক।
আর	Ares.
হোরা	Hara.
কেন্দ্র	Kentron.
কোণ	Kronas.

সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন পরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন আমাদের পক্ষেও সেইরূপ ঋণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে অসম্ভ্যতাই প্রকাশ পাইবে।"

(শব্দ কথা—ত্রিবেদী)

বাঙ্গলা ভাষায় বিদেশী শব্দ গ্রহণে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন বাস্তবিকই বলেন—

"The word telescope" is used correctly by many sailors who are entirely ignorant of its greek derivations ; the correct usage of such words as 'garage' 'Volplane' and 'camonflage' recently introduced into English from the French, does not presuppose or require the slightest knowledge of that language. We think all that is required is the uses of the technical terms in Bengali medium is the same definite agreement. The objections borrowing from a foreign tongue not related to the Vernacular were met long since by Sir Charles Trevelyan who pointed out that the Sanskritic dilects borrowed habitually from Arabic and we endorse the suggestion of Sir Guroo Das Banerjee that the technical terms should be transferred as nearly as possible from English to Vernacular.

(Part II. Vol. V. Chap. XLI. Page 38.).

স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দরের মত একজন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভক্ত সেবক ও বৈজ্ঞানিকের ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের মত একটি বিজ্ঞ সমিতির অভিমত একেবারে উপেক্ষনীয় নহে। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা লইয়া যে একটা গোল উঠিয়াছে, ইহার কোন দরকার দেখি না। যে সকল শব্দ ভাষান্তর করিলে অর্থ বিকৃত হয় সে সকল শব্দ একেবারে অবিকল রাখাই যুক্তি সঙ্গত। শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় Logic র অনুবাদ করিয়াছেন—তর্কবিজ্ঞান। কিন্তু লজিক ও তর্কবিজ্ঞান এক জিনিষ নয়। লজিক আমাদিগকে তর্ক শিক্ষা দেয় না। C. Readর মতে

—"Logic is the science that explains what conditions must be fulfilled in order that a proposition may be proved, if it admits of proof." ইংরেজী লজিক বাঙ্গলায় ও লজিক রাখিতে কি আপত্তি ? প্রথম প্রথম ইহা ব্যবহার করিতে কাহারও খটকা লাগিতে পারে, কিন্তু দুই দিন পরে সব অভ্যস্থ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে কেমিষ্ট্রীর বদলে রসায়ন অনেকটা প্রচলিত হইয়াছে। রসায়ন কিন্তু যথার্থ কেমিষ্ট্রী (Chemestry) নহে। রসায়নের অর্থ এমন একটি ঔষধ যাহা দ্বারা লোকে দীর্ঘ জীবন, স্মরণ শক্তির প্রাথর্য্য, স্বাস্থ্য ও পুরুষত্ব লাভ করে। (চরক অ—১—৬) ধরিতে গেলে ইহার রসায়নিক যুগের জীবন সলিল (ডাঃ পি, সি, রায়)। ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার কবিরাজি বিজ্ঞাপনে আছে :—

"মহামেদ রসায়ন—মস্তিষ্ক পরিচালক ও শক্তি বর্দ্ধক। মহামেদ রসায়ন—স্নায়বিক দুর্ব্বলতার আশ্চর্য্য ঔষধ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই কেমিষ্ট্রী ও রসায়ন এক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কেমিষ্ট্রী আরবী আল কেমী হইতে আসিয়াছে। এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরলোকগত ত্রিবেদী মহাশয়ের শব্দ কথা হইতে জানিতে পারি, শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত জানম্যাক (John Mak) সাহেব বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম কিমিয়া বিদ্যার

আলোচনা করেন। তাহার মতে—"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই শিক্ষা হয়। বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তু জ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২৯ বাং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে খদ্যকথা নামক ডাক্তারী পুস্তকের সমালোচনায় রসায়নের বদলে "কিমিতি বিদ্যার" ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কিমিয়া বিদ্যা শুনিতে ভাল লাগে ও আসল অর্থ বজায় থাকে এবং জনম্যাক সাহেবও ইহার প্রচলন করিয়াছেন। তাই আমি রসায়নের বদলে কিমিয়া বিদ্যার প্রচলনের প্রস্তাব করি।

১৩২০ বাং ভারতবর্ষের ৮০০ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র মহাশয় বলেন—"পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিরস্মরণীয় স্বর্গগত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে কয়েকটি য়ুরোপ প্রচলিত শব্দের অনুবাদ করিয়া নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সে অর্দ্ধ শতাব্দর কথা। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের খ্যাতনামা স্রষ্টা স্বর্গগত অক্ষয় কুমার দত্তও নূতন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক মাত্রই পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থকারেরা অনেক অনুদিত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে এখনও সে সকল শব্দের ব্যবহার আছে। "তাপমান" "ব্যোমজান" "অম্লজান" "যবক্ষারজান" প্রভৃতি শব্দ এখন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঘরে দ্বারে হাটে বাজারে সাধারণ কথা বার্ত্তায় সে সকল শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই না। অন্তঃপুরিকাগণও তাপমান যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া Thermometer শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যোমজান বলিলে অধিকাংশ লোক অর্থই বুঝিতে পারিবেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত দ্ব্যম্লজান (Bioxide) প্রভৃতি শ্রুতি কঠোর। পঞ্চাশ বৎসরেও এই সকল

শব্দ প্রচলিত হইল না। Phenyle (ফেনিল) Carbolic acid (কার্ব্বলিক এসিড) বা Sulphate of quinine (সালফেট অব কুইনাইনের) অনুবাদের আবশ্যকতাই বা কি ? শব্দ ও ভাষা মনের ভাব বিনিময়ের উপায়। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহ কোন দেশের নহে, কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। সাহিত্যের কথা পৃথক, কিন্তু বিজ্ঞান সর্ব্বজনীন, সমগ্র পৃথিবীর। ফলে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানে জাতিভেদ নাই, ভাষাভেদ নাই এবং আমদের দেশে বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই, তাহাই মনে করেন। বঙ্গদেশেও প্রকৃতি পুঞ্জের ব্যবহারে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত।

তাঁপমান যন্ত্র, অম্লজান প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ দ্বারা অনুবাদের কাজ করিলেও আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক শব্দ বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছি। একোনাইট, বেলোডুনা, আর্সেনিক চায়না, প্রভৃতির কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় নাই। প্রত্যেক শব্দের পিছে একটা "জান" জুড়িয়া দিয়া যদি নূতন শব্দ গড়া হয়, তবে জান জান করিতে করিতে আমাদের জান (প্রাণ) বাহির হইয়া যাইবে। বাঙ্গালীর এই অল্প আয়ুর দিনে নূতন নূতন বেফায়দা শব্দ গড়িয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। একেত ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে আবার যদি জান বিশিষ্ট আর একটা মহাব্যাধি আমাদের চিন্তা শক্তির পিছনে লাগিয়া যায় বড়ই মুস্কিল।

এ সমন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। তিনি বলেন "ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চমমান' 'শোষণমান' ইত্যাদি। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অনেকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ এই সকল নাম কিম্ভূত-কিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতী

কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোষ্টনের প্রধান পত্রিকা অনেক দিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন—"যে আবিষ্কার করে নাম করণের তাহারই প্রথম অধিকার।" বলপূর্ব্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবার আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল "কাঞ্চনমান" সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম বুঝিতে পারিলাম না, শেষে বুঝিলাম কুঞ্চনমান কাঞ্চনম্যানে রূপান্তরিত হইয়াছে; —হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে Kunchanman কুঞ্চনমান বানান করিয়াছিলাম হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষর মালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোন একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত যথেচ্ছারূপ উচ্চারণ করা যাইতে পারে; কেবল হয় না ঋ ও ৯ তাহারা আবার উপরে কিম্বা নীচে দুই একটা ফোটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকসিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাইতে পারে? কিন্তু ইংরেজকে বাঙ্গলা কিম্বা সংস্কৃত বলান একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের বুদ্ধিমান নাম করনের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান হইতে বর্দ্ধমান তাহা হইতে বরডোয়ান হইত। তাব চেয়ে অহেলা ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।"

(প্রবাসী)

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র এতদিন ভারতবর্ষকে জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন উহার বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিশ্ব আমাদিগকে কর্ম্ম ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে। ইহার সাড়া দিতে হইবে। বিশ্বের প্রতিযোগীতায় আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে, আমরা কয়েকদিনের জন্য উদাসীন থাকিলেও একেবারে মরিয়া যাই নাই। আমাদের পুর্ব্ব পুরুষগণের মেধা শক্তির সে অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারীত্ব আমরা এখনও হারাই নাই।

সাহিত্যই হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলন ক্ষেত্র।
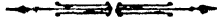
বর্ত্তমান ভারতে হিন্দু-মোসলেম একতা (Hindu muslim unity) একটি কঠিন সমস্যা। যতদিন হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলন না হইবে, ততদিন ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই। আজ এই মিলনের সূত্রপাত দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। কিন্তু এই মিলনের পথে এখনও অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। হিন্দু-মুসলমান মিলনের একনিষ্ঠ সাধক মহাত্মা গান্ধী নিজেই ১৯২২ইং ৫ই জানুয়ারীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বলেন—"There is still mutual distrust between Mussalmans and Hindus." ১৯২২ইং অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক Camonflage নামক প্রবন্ধে বলেন—"Those who have heard Moulana Muhammad Ali and Mahatma Gandhi speak from the same platform must have noticed, how carefnl they are not to tread on each other's corn and how delicately they handle the Hindu Muslim problem, as if the slightest touch of reality will break their laboriously reared house of cards", ইহার জোয়াবে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

"It is unfortunately still true that the communal or sectarian spirit is predominant. Mutual distrust is still there. Old memories are alive.' এখন যদি আমরা এই জাতীয় সংকীর্ণতা বা communal nationalism ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে না পারি, তবে প্রকৃত মিলন, কথনও সম্ভবপর নহে।

হিন্দু মুসলমান মিলনের অনেক পন্থা অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি মনে করি সাহিত্যই হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রকৃত মিলন ক্ষেত্র। "মোস্লেম-ভারতের" ভাষায়—"যদি কোন দিন বঙ্গ জননীর (আমি বলি ভারত জননীর) যুগল সন্তান হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন সম্ভবপর হয় তবে এই সাহিত্যের মহা মিলনের ক্ষেত্রেই তাহার আশা করা যাইতে পারে।"

প্রেম ও ভালবাসা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জিনিষ। প্রেম অকপট ও সরল। যেখানে প্রেম ; সেখানে হিংসা বিদ্বেষ অবজ্ঞা বা অস্পৃশ্যতা নাই। সেখানে সবই পবিত্র। এই প্রেমই মিলনের [illegible] প্রেম নাই, সেখানে মিলন অসম্ভব। বাহিরের কোন আকস্মিক ঘটনা দ্বারা সাময়িক মিলন ঘটিলেও সে মিলনটা হয় ক্ষণস্থায়ী। পাঞ্জাবের দুর্ঘটনা ও খেলাফত সমস্যায় ভারতের হিন্দু মুসলমানের মিলন স্থায়ী হইবে না, যতদিন না উভয়ের মধ্যে প্রেমের সমন্ধ স্থাপিত হয়, যতদিন না উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

তাই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ শ্রীহট্ট টাউনহলে সহরবাসীর অভিনন্দের উত্তরে "বাঙ্গালীর সাধনা" (৬। ১১। ১৯) নামক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অনেকে বলেন ব্যবসা বাণিজ্যের মিলনে কিম্বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে আমাদের দেশে একতা ঘটবে। বস্তুতঃ বিষয় বুদ্ধির দ্বারা যে মিলন ঘটে সে হয় ক্ষণস্থায়ী। মিলনের দরকার চলে গেলেই সমন্ধ ছুটে যায়।

আজ ফরাসী ইংরেজে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আর এক সময়ে এই দুই জাতের মধ্যে ঘোর শত্রুতা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। য়ুরোপের ইতিহাস এই গরজের বন্ধুত্ব একবার গড়চে, একবার ভাংচে, এত বারম্বার দেখা গেছে।

"তাই আর একবার আমাকে বলতে হবে—সকলে মিলে আমরা পাব, সেই হিসাবের উপর আমাদের মিলন হবে না। পরস্পর পরস্পরের জন্য দেব এই বেহিসাবী প্রেমের সমন্ধেই আমরা মিলতে পারব।

গত উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান সমস্যা (Hindu-Moslem Problem) বলিয়া কোন সমস্যা ছিল না। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গুহের প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি, Dr. Taylor তাঁহার Topography of Dacca গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের ২৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন :—

(Published in the early part of the Nineteenth century and in 1839 A. C.)—"Religious quarrels between the Hindus and Mohammadans are of rare occurance. These two classes live in perfect peace and concord and a majority of individuals belonging to them have even overcome their prejudices so far as to smoke from the same Huka".

এখনও গ্রাম্য সমাজে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যা নাই। আমি নিজে গ্রামবাসী এবং আমার এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। "বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া হিন্দু মুসলমান ক্রমশঃ পরস্পর-বিরোধ ত্যাগ করিয়াছিলেন; মুসলমান তখন আর বৈদেশিক নহেন; ভারতবর্ষে বাস করিয়া তিনিও ভারতবাসী হইয়াছেন তাহার শাসন হিন্দুর নিকট আর কঠোর বৈদেশিক শাসন বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রাম্য সমন্ধ স্থাপিত হইয়া সৌহার্দ্দের বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছিল। কাজি সাহেব চৈতন্য দেবকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই সৌহার্দ্দের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়।

"গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্ত্তি হন আমার চাচা।
দেহ সমন্ধ হইতে গ্রাম সুমন্ধ সাচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি হয় তোমার নানা।
সে সমন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

চৈতন্য চরিতামৃত

(প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি – পৃ - ৪)

এই হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও বিদ্বেষ ভাব আমাদের দেশেরই তথা কথিত ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই অমিলনের জন্য আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যই বিশেষ ভাবে দায়ী। সেই বিদ্বেষ-বীজ এখন মহাবট বৃক্ষে পরিণত হইয়া চারিদিকে ডাল পালা বিস্তৃত করিয়া দেশের মহা অনর্থপাত ঘটাইতেছে। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গুরু বৈদেশিক ঐতিহাসিক ও সমালোচক ও পাদ্রীগণের অনুকরণে হিন্দু মুসলমান একে অন্যকে কামড়াইয়া ও অবুঝ শিশুর ন্যায় উভয়ে উভয়কে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া বেশ একটা কিম্ভূত কিমাকার সাজিয়াছিলাম। আমাদের এই অদ্ভুত তামাসা দেখিয়া বৈদেশিক জাতিরা বেশ এক গাল হাসিয়া লইয়াছিল।

"জাতির ইতিহাস বলিয়া তাহাকে যাহা পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা পড়িয়া তাহার একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাহার নিজস্ব যাহা কিছু অধিকাংশই মন্দ। আর দেশে যে টুকু ভাল আছে সে টুকু শুধু ইংরেজেরই অনুকম্পায়। সে ইতিহাস পড়িয়া শেখে, যে, শিবাজী একজন পার্ব্বত্য তস্কর, আওরঙ্গজেব এক হিন্দু-বিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা, সিরাজউদ্দৌলা এক নারকীয় কুকুর ও সমস্ত বাঙ্গালী—যখন ইংরেজ রাজ প্রথম এদেশে পদার্পণ করেন—শঠ ও মিথ্যাবাদী."

(বঙ্গবাণী)

"টডের রাজস্থান পড়িয়া অনেকে সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি এবং ভবিষ্যতে অনেকে উপকৃত হইবেন। কিন্তু ইহার দ্বারা অনিষ্টও হইয়াছে। হিন্দু মুসল-মানের বৈরভাব জন্মাইবার ও জাগাইয়া রাখিবার একটি প্রধান কারণ এই গ্রন্থখানি। আমরা যেমন এই গ্রন্থ পড়িয়া এবং এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বহু কাব্য উপন্যাস নাটক হিন্দু মুসলমানের অতীত ঝগড়া জাগাইয়া রাখি, ইংরেজেরা তেমন করিয়া কোন গ্রন্থের সাহায্যে এংলো-স্যাক্সন ও নর্ম্মানের, ইংরেজের ও স্কচের এবং রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের ঝগড়া জাগাইয়া

রাখে না। আমরা অতীত ইতিহাসকে লুপ্ত বা বিকৃত করিতে বলিতেছি না, কিন্তু অন্য সকল দেশের ইতিহাস সেই সেই দেশের ইতিহাসও যাহাতে তেমনি করিয়া লিখি ও পড়ি তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

(প্রবাসী ১৩২ বাং)

আমরা নিজে পাপ করিয়াছি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এখন উপস্থিত। সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া—অতীতের বাদ[illegible]সাহিত্য হইতে কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া।

আজ আমাদের আর সে দিন নাই। আজ সেই মোহাম্মদ ঘোরীও নাই, সেই পৃথ্বিরাজও নাই। সেই আকবরও নাই, সেই রাণা প্রতাপও নাই। সেই আওরঙ্গজেব নাই, সেই শিবাজীও নাই। সেই দিল্লীও নাই, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনাপুরও নাই। আজ আমাদের সকলেরই এক আসন। আজ হিন্দু মুসলমানের গৌরব গাথা অতীতের বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে কেন আমরা অবোধ শিশুর ন্যায় পরের কথায় পরস্পরের মধ্যে বেফায়দা ঝগড়া করিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। অতএব আসুন আমরা মনের কালিমা দূর করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করি।